সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ

সোমেন্দ্রনাথ বসু

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ২১১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।
কলিকাতা-৬।
অশোক রাজপথ।
পাটনা।
৪৪ জনস্টনগঞ্জ।
এলাহাবাদ-৩।

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রবাসী অগ্রজ
শচীন্দ্রনাথ বসুকে

সূচী

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র চিন্তা

কবি, গীতিকার ও নাট্যকার যাঁরা তাঁরা চাপা পড়েন তাঁদেরই সৃষ্টির অন্তরালে। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী তাঁদের রচনাকে অংশবিশেষে সযত্নে গ্রহণ করে কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও পরিচয়কে বিস্মৃতির অতলে নিক্ষেপ করে। রামায়ণ মহাভারতের কবি তাঁদের কাব্যের আড়ালে নিঃশেষে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের চরিত্রবত্তা, মহানুভবতা, ঔদার্যের কোন কাহিনী জানা নেই। তেমনি ব্যবহার পেয়েছেন কালিদাস, সহস্রাধিক বছর তাঁর কাব্য ভারতবর্ষের নানা ধরনের রসিক চিত্তকে রস জোগালো কিন্তু কবি কালিদাস কেমন মানুষ ছিলেন তার একটি কথাও আজ জানবার উপায় নেই। পাশ্চাত্যদেশে আজ কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুলছেন আদৌ শেক্সপীয়র ছিলেন কিনা—ছত্রিশখানি নাটকে তাদের রচয়িতার সমস্ত পরিচয় গোপন করে তাঁকে গল্পকথায় পরিণত করেছে।

এই সব কবিদের তুলনায় অনেক আধুনিক কালের লোক হলেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা যায়। কাব্য নাটক উপন্যাস গানের সুউচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে লুপ্ত হয়ে গেলেন। আমরা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলি কি উদার হৃদয়, কি দুর্জয় সাহস, আশুতোষের বাংলা ভাষার প্রতি কি প্রীতি, বাংলার বাঘের কি বিস্তৃত বক্ষপট; দেশবন্ধুর কি অজস্র দান; বিবেকানন্দের কি প্রবল দেশাত্মবোধ; —কেবল রবীন্দ্রনাথের বেলায় বলি কি আশ্চর্য তাঁর গীতাঞ্জলি। তখন বলিনে তাঁর নিঃস্বার্থ সাধনার কথা, রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর নির্ভীক বলিষ্ঠ মতামতের কথা, বলিনে দেশের জন্য তাঁর দুঃখবরণের কাহিনী, বলিনে বিদ্যালয় গঠনে তাঁর ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধনের কথা, বলিনে তাঁর

গ্রামমুখী দেশপ্রীতির বাস্তব কর্মবাদী প্রকাশের কথা। বরং এই উপলক্ষে ঠিক উল্টো কথাই রটে—তিনি ছিলেন আবাল্য বিলাসলালিত, রাজনীতির কঠিনমার্গে তাঁর কল্পনাবিলাসী মনের দেবার কিছু ছিল না, দেশকে তিনি জানতেন না, খেয়ালখুসীতে কেটেছে দিন। মানুষ রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সবার দৃষ্টি থেকে দূরে রইলেন, নানা বিচিত্র ঘটনায় তাঁর প্রবল চরিত্রশক্তির যে বহুমুখী প্রকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারতো তার হিসেব চাপা পড়লো।

এ কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন তুলনাহীন, মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নিয়েও তেমনি তুলনাহীন। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের যথাযথ অনুশীলন এ দেশে আজও হয় নি। লোকোত্তর প্রতিভা শিল্পের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে চমকিত করেছে যে তার অন্তরালে মানুষটিকে ভাল করে জানবার কথা আজো আমাদের মনে এলো না। তাই নানা ভ্রান্ত ধারণার তরল কাহিনী রচনার শেষ নেই আজও। শুধু চরিত্র নয়, তাঁর বিপুল বিরাট কর্মপ্রচেষ্টাও আমাদের চোখে স্পষ্ট হলো না। বহু লোকে জেনেছে তাঁর বিশ্বভারতী রাজা মহারাজার অর্থে গড়ে ওঠা নাচগান ছবি আঁকার কেন্দ্র। বিশ্বভারতীর জীবন গঠনের যে বিরাট প্রয়াস তা কেই বা জানছে আর জানলেই বা কে বুঝছে যে এই পরিকল্পনা কোন সরকারী শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারের নয়, একজন জীবনপ্রমত্ত আলোকসন্ধানী কবির।

সাধনার কঠিন ইতিহাসকে ভুলে যখন সাধনার ফসলগুলির হিসেব নিই তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতাবশেই মনে করি শুধু কল্পনা থেকে ফসল ফলে। যে বিরাট ব্যাপক মন্ দেশের প্রত্যেকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে কোন শক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে বুদ্ধি ও বিচারের পথ খননের প্রচেষ্টা করেছে তা আমাদের অগোচরেই রয়ে গেল। তখনই নানা অর্বাচীন ধারণার পঙ্কস্রোতে তলিয়ে গিয়ে বলি দেশের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। আমি তো জানি না (আর কেউ জানেন কিনা বলতে পারি না) অন্য এমন কোন সাহিত্যিক বা স্রষ্টাকে যিনি দিনের পর দিন দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি নিয়ে ক্রমাগতই রচনা প্রকাশ করে চলেছেন

—সাময়িক উত্তেজনা পরিপোষণের জন্য নয়, উত্তেজনার অন্তরালে সমস্যার যথার্থ তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য। জাতির জীবনকে এমন সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা রামমোহন ছাড়া ভারতের অন্য কোন মনীষী কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি সমাজনীতির ক্ষেত্রে করেন নি। জীবন তাঁর কাছে পূর্বার্জিত নীতিবাক্যের ও শাস্ত্রবচনের প্রাণহীন জড়সমষ্টিমাত্র নয়। দিনে দিনে নানা দুঃখে, নানা আঘাতে, ত্যাগে ও কৃচ্ছ্রসাধনে, লজ্জায় ও অপমানে তিনি জীবনে নিজের বেঁচে থাকার মূল্য অর্জন করেছেন। সে কাহিনী পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন আছে, তাতে দেশ তার প্রেরণার আর একটি অক্ষয় উৎস খুঁজে পাবে।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রধানতঃ যুক্তিমার্গের পথিক ছিলেন একথা আগেই বলেছি। এই অন্ধ মূঢ়তার দেশে তিনি নির্বিচারে মেনে নেবার সহজ লোকপ্রিয় পথ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মধ্য দিয়ে এ দেশের বুদ্ধির নবজাগরণ একটা সার্থক পরিচয় পেলো। মনে রাখতে হবে যাঁরা অচলায়তনের দরজা ধরে নাড়া দেন তাঁরা শুধু বুদ্ধির অধিকারী নন, দেশের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই তাঁদের বুদ্ধিকে শক্ত করে, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে যেতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ধরনের দেশপ্রেমিক যাঁরা দেশের চিরন্তন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন, প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তর্কের আসরে নেমেছেন, কিন্তু লোকরঞ্জনের কবিয়ালী করার দৈন্য না থাকায় যাঁকে বারে বারে সরে যেতে হয়েছে কল্পনাবিলাসের অভিযোগ মাথায় নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যুক্তিবাদী মানুষ হলেই হৃদয়হীন হবে এমনি একটা অদ্ভুত ধারণা ভাববাদীরা প্রকাশ করে থাকেন। একটা সস্তা কথা এই প্রসঙ্গে বার বার শোনা যায় যে শুধু বুদ্ধিতে কিই বা হয়, হৃদয়ে ভাবের ঐশ্বর্য যদি না থাকে। এ কথা কে না জানে যে বোধ আর বুদ্ধির মিলন না ঘটলে আলো জ্বলে না। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসার অভাব ছিল না, কিন্তু সে ভালবাসা অন্ধ নয় তাই যখনি প্রয়োজন হয়েছে তিনি দেশের মানুষের নানা নির্বুদ্ধিতাকে তীব্র আঘাত করেছেন তাতে মানুষটির দীপ্তি বেড়েছে, তাঁর মহত্ব রবিকরের মত উজ্জ্বল হয়েছে। বার

বার দেশের চলতিধারা থেকে তিনি দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় গেছে যখন প্রচণ্ড উম্মত্ততার দিনে তিনি একলা ভেবেছেন এবং তা প্রকাশ করেছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রে একলা লড়াই করার যে সাহস তার মর্যাদা আমরা দিতে শিখিনি। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকার যোগ্য সমাদর এ দেশে হলো না। খোলা মাঠে রাজনীতির তরোয়াল না ঘোরালে দেশকে কেউ সাহসের সঙ্গে সেবা করেছে এ কথা আমরা ভাবতেও পারি না। তাই রবীন্দ্রনাথের দেশ সেবার যে অংশটুকু স্বীকৃতি পেয়েছে তা হলো বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের তিনি চারণ কবি, তিনি বাংলার জয়গান গেয়েছেন। অর্থাৎ আসল কথা হলো যতটুকু ক্ষেত্রে তিনি দেশশুদ্ধ লোকের আন্দোলনের সঙ্গে মিলেছেন ততটুকুতেই তাঁকে আমরা মেনেছি। যেখানে তিনি একলা দাঁড়িয়েছেন—শুধু গানের আর কাব্যের সম্পদ নিয়ে নয় চিন্তার ঐশ্বর্য নিয়ে, যে ঐশ্বর্যের অধিকার আমরা অর্জন করতে পারিনি, সেখানে তাঁকে আমরা ত্যাগ করেছি। তাঁকে তো স্বীকার করিই নি এমন কি তাঁর একলা দাঁড়াবার প্রশান্ত সাহসকেও স্বীকার করার ঔদার্য দেখাই নি, কবির ভাববিলাস বলে অবজ্ঞা জানিয়েছি।

মনে পড়ছে একটা ঘটনা—১৯১৮ সাল, ম্যাকেঞ্জী মিউনিসিপ্যাল বিল এনে বাঙ্গালী কমিশনারদের ক্ষমতা অপহরণে উদ্যত হলেন। আন্দোলনের একটা অংকুর দেখা দিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সেই আন্দোলন থেকে সরে রইলো। গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা চক্ষুলজ্জায় যতীন্দ্রমোহনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন থেকে সরে আসতে পারছেন না। তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তাও রাখব অথচ নিজের মতের স্বাধীনতা এবং কর্তব্য রক্ষা করে চলব এ দুটোর মধ্যে কোন অবশ্য বিরোধ নেই।' এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের অপরিচিতই রয়ে গেলেন। কত বিভিন্ন বিষয়ে সাহস ঔদার্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নিজের পথ কেটেছেন তা মনে রাখিনি বলেই শুধু কবির মালা দিয়ে তাঁকে রেখেছি আলমারীতে মোটা রেক্সিনে বা চামড়ায় বাঁধিয়ে। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে জানতে চাইনি তাই এত বড়

প্রতিভার, এত বড় দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের জীবনে ও চিন্তায় পড়লো না।*

আজকের দিনে একটা প্রশ্ন উঠেছে,—সমসাময়িক কালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল শিথিল। তিনি ছিলেন দূরের দিকে চেয়ে নয়তো ভবিষ্যতের অচলায়তনের দ্বার-ভাঙ্গা গুরুর অপেক্ষায়। বর্তমান সেই অতীতের রোমন্থন বা ভবিষ্যতের কাব্য পেলো দু-একটা। আর কি পেলো? অজ্ঞানতাজাত এই প্রশ্নের উত্তর ছড়ানো আছে ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শনের পাতায় পাতায় শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনায়। পূর্ণ যৌবনের দিনে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি লিখতেন তার প্রত্যেকটির ছত্রে ছত্রে দেশের জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা যেমন অনুভব করা যায় তেমনি সমস্যা সমাধানের বুদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিতও দুর্লভ নয়। আর কোন্ দ্বিতীয় লেখক বাংলায় আছেন যিনি মৌলিক সাহিত্য কর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা সমস্যাকে বিচার করেছেন, এবং সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করতে চেষ্টা করেছেন। আজকের দিনে রাজনৈতিক দল, শক্তিশালী সংবাদপত্র গোষ্ঠি, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মনোভাবের কথা মনে রেখে আমাদের সমাজ সচেতন সাহিত্যিকরা দেশ সেবা করেন। রবীন্দ্রসমালোচনায় যাঁরা উগ্র তাঁরা বিদেশযাত্রার নিমন্ত্রণে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, সে যে দেশেই হোক। তাঁরা তো জানেন যে নানা দেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান এসেছে এবং জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্যে ১৯১৬ সালে, প্রবাসী স্বদেশবাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি ক্যানাডায় যাননি, নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজকের দিনে যাঁরা দেশপ্রেমী সাহিত্যিক, যাঁরা সমাজ সম্বন্ধে খুব সচেতন তাঁদের কাছ থেকেও এ ব্যবহার পাওয়া দুরাশা।

তেমনি দেখেছি তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে। সেখানে তিনি হিন্দু, আদি ও সাধারণ ব্রাহ্ম কাউকেই ছেড়ে কথা বলেন নি কোন দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে। এখানেও সেই বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত বীর্যবান নায়ককে দেখা গেল যিনি ধর্মকে কোন মত, কোন রীতি, কোন শাস্ত্রের সীমায় বাঁধতে রাজী হলেন না। নিজে বহুদিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরে বলতে পারলেন যে, ঐ আদি ব্রাহ্ম সমাজ ঠাকুর পরিবারের

স্বর্ণথলীর সূত্রে বাঁধা। কোন আত্মীয়তার স্নেহাকর্ষণ, কোন পুরানো স্মৃতির দুর্বলতা পিছনে টেনে রাখতে পারলো না। যে গণ্ডি একদিন নিজে বেঁধেছিলেন সচল জীবনের দাবিতে নিজেই তাকে ভাঙলেন।

ধর্ম তাঁর জীবনে কোন বহিরাগত শাস্ত্র ও নীতিবচনের প্রতি আনুগত্য হিসাবে আসেনি। এ ধর্ম তাঁর অন্তরের উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে জাত। তার সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগ, তার সৌন্দর্যের সঙ্গে, রূপের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে তা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। তাই কোন আচরণই তাঁর জীবনে চরম আচরণ ছিল না। নিত্যনূতন দিগন্ত দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হয়েছে, তাঁরও মতামত বদলেছে। সেখানেও তাঁর সঙ্গী নেই। সেখানে হিন্দু সমাজ তাঁকে দূরে ঠেলে, ব্রাহ্মসমাজ অস্বস্তি বোধ করে। ধর্মের পুঁথিগত গণ্ডির বাইরে যে বিরাট মানবধর্মের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে সেখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাই ভাবনার ও ভাবের জগতে তিনি নিতান্ত একলা, বন্ধুজনহীন।

এখানে সেই মানুষকে পেয়েছি, নিজের বিশ্বাসের, নিজের বিচারবুদ্ধির রাজপথ থেকে যাকে একটুও সরানো যায়নি। তার জন্যে কোন আস্ফালনের হুংকার, কোন দম্ভপ্রকাশের বিক্রম প্রয়োজন হয়নি। স্থির অটল শান্ত ব্যক্তিত্বের প্রবল সাহস রবীন্দ্রনাথের স্বভাবগত ছিল।

বহুবার তাঁকে দেখেছি রুদ্রমূর্তিতে—দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেখানে কারও মুখাপেক্ষা ছিল না—না কোন শক্তিগোষ্ঠির, না কোন প্রতাপশালী বন্ধুর। সম্মানের প্রলোভনে আসক্ত হবার বহু ঊর্ধ্বে তিনি, যদিও সম্মান ও সমাদরে আনন্দিত না হবার মত শীতল ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না। তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, জার্মানির বিরুদ্ধে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যখনই সময় হয়েছে তখনই তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অথচ পাশ্চাত্যের প্রতি এত বিপুল শ্রদ্ধা তখনকার দিনে আর কার ছিল? আজকের লাঞ্ছিত আফ্রিকার অপমানিত ধর্ষিত সত্তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি সেদিনই ফিরেছিল যেদিন আমাদের সমগ্রদেশ নিজের সমস্যাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে রত ছিল। আর দেখেছি নানা সময়ে যখন রাজনৈতিক নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের

প্রতিবাদ করতে গিয়ে আইনগত জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়তেন তখন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে দেশের প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে। হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, আন্দামান রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে প্রকাশ্য প্রান্তরে বক্তৃতারত তাঁর আর একটি মূর্তি। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ বছর পার হয়ে গেল, নানা লজ্জাজনক দুঃখকর হত্যাকাণ্ড দেশে ঘটলো, কিন্তু প্রতিবাদের সেই ভাষা সাহিত্যসেবীদের কণ্ঠ থেকে আর শোনা গেল না।

সেই রবীন্দ্রনাথকে কি একেবারেই ভুলে যাব। যিনি সাহসী, যিনি চিন্তাশীল, যিনি সংগ্রামী, যিনি অন্যায়ের আপোষবিরোধী শত্রু। তাঁর কাব্য, সাহিত্য, তাঁর গান, তাঁর প্রবর্তিত নৃত্যকলার আড়ালে যদি তাঁকে ভুলে যাই সে অপরাধ আমাদের সমগ্র জাতির।

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে পুরুষানুক্রমে গায়ত্রীমন্ত্রে তাঁদের দীক্ষা—"এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়"। ব্রাহ্মধর্মের পথ ও মত নির্ধারণ করতে গিয়ে এই গায়ত্রীমন্ত্রের গভীর আবেদন তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। মনের ভিতর যখন গভীর অতৃপ্তি, যখন উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তখন গায়ত্রীমন্ত্রের গূঢ় ভাবার্থ তাঁকে বিশ্বাসের ভিত্তি যুগিয়েছে। সেই অনন্ত তেজোময় পুরুষ যেমন আকাশের গ্রহনক্ষত্র-গুলিকে পরিচালিত করেন তেমনি তাঁকেও পরিচালিত করেন, এই বোধ ক্রমে ক্রমে তাঁর অন্তরের ভিতর দৃঢ় হতে লাগলো। এ গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর কাছে নিছক উপাসনার মন্ত্র ছিল না, এ তাঁর সারা জীবনের সুর বেঁধেছিলো। আত্মজীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দিদিমার কথায় বলছেন—"কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত করিতেন; সূর্যোদয় হইতে সূর্যের অস্তকাল পর্যন্ত সূর্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময় ছাদের উপর রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম, এবং সেই সূর্য অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল।"

সূর্যবন্দনার মন্ত্রে দেবেন্দ্রনাথের শিশুচিত্ত আলোকিত হয়ে উঠেছিল, তাই ধর্মসাধনায় কোন অন্ধ জড়তার বিকৃতি তাঁর বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সেই সুস্থ জীবনদৃষ্টি, সেই সংস্কারমুক্ত সাধনার সম্পদ তিনি কি ঐ গায়ত্রীমন্ত্রের মধ্যেই পেয়েছিলেন—তৎসবিতুর্বরেণ্য ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ। উদার উন্মুক্ত মহর্ষির জীবনদর্শনের পিছনে ছিল সেই সবিতাদেবের নিত্য আরাধনা, সেই তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্ময় আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষের প্রাণখোলা প্রশস্তি।

তাঁর সাধনার ঐ মন্ত্রটি আশ্চর্যভাবে অনুবর্তিত হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনে। যে প্রশান্ত আকাশ আমাদের জীবনের পটভূমিকা রচনা করে, যে দীপ্তিকেন্দ্র সূর্য আমাদের জীবনে তেজ বিকীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথের সাধনা তার প্রতি বিমুখ ছিল না। নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনের স্রোতে কোথাও ধ্যানমগ্ন হয়ে থেমে থাকা রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার অঙ্গ ছিল না। মহর্ষির জীবনেও দেখেছি ধর্মবোধ তাঁকে গিরিকন্দরের অন্ধকারে ঠেলে দেয়নি, জীবনের নানা দাক্ষিণ্যকে অগ্রাহ্য করে নিজের চতুর্দিকে ধর্মবুদ্ধির অভিমানের বেড়া তুলতে দেয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন "জলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব, বিদেশে বিপদে সংকটে পড়িয়া তাঁহার পালনী শক্তি অনুভব করিব।"

মহর্ষির পরিণত বয়সের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এক পত্রে লিখছেন—"আমরা সমুদ্রতীরে থাকতুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্যের মতো বোধ হতো।" এমন বহু রচনাংশের উল্লেখ করা যায় যেখানে সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় বস্তুর সমতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ জীবনে বলছেন, "ভোরবেলা উঠে বসে থাকি, অপেক্ষা করে থাকি কখন আমার আকাশের মিতা আসবে, আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেবে। কি করে এ নামের ঐক্য হলো জানিনে, আমি যে আলোর পূজারী, সূর্যোপাসক।"

মানুষের চতুর্দিকে আনন্দের অবারিত স্রোত চলেছে, যেন আমাদের আনন্দ দেবার জন্যেই সকাল সন্ধ্যা উদয়াস্তের লীলা। যেন আমাদের মুগ্ধ করার জন্যই আকাশের নিবিড় নীলিমা কখনো সাদা মেঘের ভেলা ভাসায় কিংবা কখনো ঢাকে কালো মেঘে। যেন আমাদের আলোর বার্তা শোনাবে বলেই লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে ভেসে আসে নক্ষত্রমণ্ডলীর ক্ষীণ দীপ্তি। যে কবির মন ভূমার আকর্ষণে ভুলেছে সে কি ঐ রূপ ঐ সুধার স্পর্শ না নিয়ে পারে। কবির মনের দ্বারে সাড়া তুলবে বলেই তো এত আয়োজন। যুগ যুগ ধরে দিনযামিনীর এই মালা গাঁথা, অনন্ত কাল ধরে মানুষের জীবনের বিচিত্র তরঙ্গের ওঠা নামা এ সবই তো সেই এক অনাগত আগন্তুকের জন্যে, যার মনের কাছে বার্তা পৌঁছাবে, আলোকমন্ত্র যার

সৃষ্টির কর্মশালার মধ্য দিয়ে সর্বকালের মানুষের সামগ্রী হয়ে উঠবে। সেই বহু অপেক্ষিত কবি রবীন্দ্রনাথ যিনি সবিতার তেজে, সূর্যের কিরণধারায় স্নাত হয়ে সেই অমৃত আলোর বার্তা মানুষকে শুনিয়েছিলেন।

প্রভাত সংগীতের কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। বহুকালের ঘুম ভেঙ্গে নির্ঝর জেগেছে, জেগেছে প্রাণ। নূতন যাত্রা, নূতন গতির লীলাচঞ্চলতা প্রকাশ পেলো। দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে যখন থাকতেন তখন একদিন দেখলেন বাইরের আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে—"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছেল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে একটা পর্দা সরিয়া গেল।...আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিচ্ছেদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" অকস্মাৎ সংসারের এই সত্যরূপটা কবি দেখলেন, তার জন্য কোন প্রস্তুতি ছিলনা, কোন লগ্ন গণনার অপেক্ষা ছিলনা, এতদিন চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, "আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।"

সমস্ত চেতনায় একটা নাড়া লাগলো। সে আলো শুধু বাইরের পথে পড়লো না, পড়লো চেতনার সর্বাঙ্গ ছেয়ে। অন্ধকারের ভিতর থেকে আলোর জগতে সে এক অপূর্ব উত্তরণ, তাইতো বলতে পারলেন "আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর।" ঐ যে রবিকর নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙ্গতে এলো ওতো কবির চেতনায় একটি বিশেষ মুহূর্তের অপূর্ব জাগরণ।

সূর্যমন্ত্রের সাধক বলেই কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির স্রষ্টারা নির্মমভাবে গতানুগতিকের বেড়া ভাঙতে পেরেছেন, আর তেমনি আশ্চর্য রসবোধের সঙ্গে নূতনকে গ্রহণ করেছেন নূতন সৃষ্টির উপকরণ হিসাবে। জীবনকে নিরাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাঁরাই দেখতে পেরেছেন আলোর জন্য অন্তরে অফুরন্ত তৃষ্ণা ছিল বলেই। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই আলোর উপাসনা

করেছেন সারাজীবন আর বিশ্বের রসিকচিত্তকে বিতরণ করেছেন সারাজীবনের ধ্যানলব্ধ আলোর কণিকা। এই যে পৃথিবী তার তরুশ্রেণী সাগর পর্বত নিয়ে নানা খেলায় কাল কাটিয়ে চলেছে তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ আছে—এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ প্রিয় ভাব। একটি মানুষ বা একটি প্রাণ সে কি কেবলই এই বিরাট সৃষ্টিতে একটি দুর্ঘটনামাত্র। তার কি বৃহত্তর কোন জীবন প্রবাহের সঙ্গে যোগ নেই। তার আসা তার যাওয়া সবটাই কি খেয়ালীর খেয়াল মাত্র। নানা কবিতায় নানা প্রবন্ধে, নানা চিঠিপত্রে কবি বার বার বলেছেন যে কোন্ অনাদিকাল থেকে জীবনের স্রোত চলেছে, সেই স্রোত জড়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে অবিরল ধারায় বয়ে চলে ; চেতনে অচেতনে তার প্রকাশ। সেই গোপন প্রাণপ্রবাহিনী পৃথিবীকে কবি বলেছেন—সূর্যসনাথ। "যখন সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার মনের এই ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অংকুরিত মুকুলিত, পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব।" স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সেই স্মৃতির অতীতকাল থেকে যে প্রাণের প্রবাহ তা সূর্যতেজে সঞ্জীবিত বলেই কালে কালে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। তাই তো পৃথিবী সূর্যসনাথ ; তাইতো রবীন্দ্রনাথের সূর্যবন্দনা প্রকৃতপক্ষে জীবনবন্দনা।

পূরবীর 'সাবিত্রী' তাঁর সূর্য প্রণামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। ঐ কবিতায় কবি বলছেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রত্যূষে বহ্নিবীণাবক্ষ, দীপ্তকেশ উদ্‌বোধিনী বাণীর চুম্বন তাঁর কপালে লেগেছিল। সে প্রথম প্রভাত মানুষের স্মৃতির ওপারে, দিন গণনার বেড়া বেঁধে মানুষ তাকে আটকে রাখতে পারেনি। সেই চুম্বন যে অতৃপ্তির দাহ বুকের মধ্যে জাগিয়ে দিল সেই অতৃপ্তি কবির ভাষাকে উদ্দাম আবেগে তরঙ্গিত করেছে। সকল তমসা ধ্বংস করে আদি কবি সূর্যের বাঁশী বেজে উঠুক ; সে বাঁশী আর কেউ নয় সে কবিরই চিত্ত। আদিকবি সূর্যের বংশীধ্বনি কবির চিত্তের সকল তমসা দূর করুক। কিন্তু শুধু তো প্রার্থনা নয়। যুগ যুগ ধরে যে সূর্য বিশ্বলোকে প্রাণ বিকীর্ণ করে চলেছে, বিতরণ করেছে তেজ তার সঙ্গে নিজের ধাতুগত ঐক্য

ঘোষণা। কত যে অজস্র প্রাণকণিকা সেই প্রাণকেন্দ্র তেজোময় অগ্নিপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার শেষ নেই। পৃথিবীর চেতন অচেতনে প্রাণের অজস্র সমারোহ ভেসে আসছে প্রতিদিন, তাই কবি বলছেন—

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান সুরের তরণী
আয়ুস্রোত মুখে,
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।

যুগ যুগান্ত ধরে আদি কবি তাঁর ছিন্নতান সুরের তরণী পাঠিয়ে চলেছেন! মূল সুরের আবেগ, আদি কবির প্রাণের কম্পন তাঁর মনের অন্দরমহলে সৃষ্টির কাজ সুরু করে দেয়। নানা বর্ণের নানা স্বপ্নের জাল বোনা হতে থাকে। কিসের প্রেরণা আসে, কি সে শক্তি যা তাকে এমন করে ভরিয়ে তোলে, কবি অবাক বিস্ময়ে ভাবেন—"তেজের ভাণ্ডার হতে কি আমাতে দিয়েছ যে ভরে কেই বা তা জানে।"

এমনি করে প্রাণ যে ভরে রেখেছে, জীবনকে যে দিয়েছে শক্তি সেই রবি যখন শরতের সোনার বাঁশীতে মূর্ছনা জাগায় বিশ্ব তখন উন্মনা হয়ে ওঠে—কোন্ সুদূর মনকে হরণ করে নিয়ে যায়, কিসের ডাকে কবির রাগিনী বিবাগিনী হয়ে চলে,—

সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি

দিনান্তে অগ্নি উৎস ধারে তাঁর রাগিনীর সমস্ত আবেশ ধৌত হবে। 'সাবিত্রী, রচনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

সূর্য উঠবে, সে সূর্যের আলো যদি প্রাণের মধ্যেও না অন্ধকার ঘোচায় কেনই বা তার উদয়। প্রতিদিন মানুষ জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়ায়, সংসারের নানা তুচ্ছ বস্তু তাকে ঘিরে ফেলে। তার অন্তরতম সত্য স্বরূপ বস্তুর আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। হাসিকান্নার আবর্তে পাক খায় মানুষ, স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্বুদে ফেনিয়ে ওঠে জীবন। প্রতিদিন রাত্রি আসে, আকাশ অন্ধকারে ভরে যায়, কিন্তু আবার আসে প্রভাত, "প্রথম সৃষ্টির

অক্লান্ত নির্মল দেববেশে।" সেই জাগরণ দেখে, সেই আলোর বন্যা দেখে কবি আপন অন্তরলোক অন্বেষণ করেন। যদি পৃথিবীর প্রত্যহকার অন্ধকার ঘোচে তবে মনের অন্ধকার কেন ঘুচবে না। উপনিষদের ঋষি বলছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্তে পূষন্ন পাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

কবি সেই মন্ত্রই বাংলায় বলছেন

তখন মনে পড়ে সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি কবির প্রার্থনা মন্ত্র,
যে মন্ত্রে বলেছিলেন—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন
উন্মুক্ত কর সেই আবরণ। (পত্রপুট : ১০)

এই যে অণুপরমাণু নিয়ে গড়া দেহ, এই দেহ সেই সবিতার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায় রচিত। এর স্থূল চেহারাটা প্রতিদিনই তো দেখছি, নানা কাজে ঐ দেহটাকে নিয়েই তো মেতে আছি। কিন্তু কোন্ অজানা দিন থেকে ঐ রবিরশ্মি বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্ত করে দিই নিজেকে 'প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ' আর বলি,

হে সবিতা
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ এই আচ্ছাদন। (পত্রপুট : ১০)

আর তোমার অগ্নিকণায় রচিত এই দেহের মধ্যে অণু পরমাণুর অলক্ষ্য অন্তরে যে কল্যাণতম রূপ আছে 'তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।' চিরকালের যোগ কবির অন্তরতম সত্যের সঙ্গে ওই সবিতার, যার বন্দনামন্ত্রে বালক রবীন্দ্রনাথের মন উন্মনা হয়ে উঠতো। শুধু নিজের সঙ্গেই যে যোগ তাও নয়, যুগসন্ধির কবি ইতিহাসের মধ্যে মানুষের মনের কথা শুনেছেন, যে কথা ঐ স্তিমিতকেন্দ্র জ্যোতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ঘোষণা করে সকল তুচ্ছতার বাইরে নিয়ে যায় তাঁকে—

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহাস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্য সাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রি গিরিতটে,—
বলেছে, জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
বলেছে, দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহানপুরুষের আবির্ভাব। (পত্রপুট : ১০)

এমনি করে শুধু প্রাচীন যুগে নয়, শুধু নিজের দেহে নয়, সর্বকালের সর্বযুগের মানুষ যে তার সমস্ত সত্তায় অন্ধকারের পার থেকে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব দেখেছে, কবি সেই দেখার কথাই বলেছেন। জীবনকে আলোর মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্যই কি গায়ত্রী মন্ত্র তাঁর জীবনকে, তাঁর পিতার জীবনকে, তাঁদের পারিবারিক জীবনকে এমন করে ফুটিয়ে তুলেছিল।

পত্রপুটের ১৫নং কবিতায় কবি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সূর্যের যোগ দেখিয়েছেন। সামাজিক অনুশাসনের বাঁধা পথ দিয়ে যে ধর্মের রথ চলে সে রথে কবির আসন নেই। নানা শাস্ত্রে যাকে সপ্রমাণ করা হয়েছে, যার অস্তিত্ব ঘোষণায় অহংকৃত পাণ্ডিত্য নিয়োজিত তাকে কবি স্বীকার করেন নি, তাই দেবতার বন্দীশালায় তাঁর নৈবেদ্য তিনি পাঠান নি। যে প্রাণের মন্ত্র তাঁকে বহির্জীবনের অবকাশে দৃষ্টি মেলে সুন্দরের সাধনা করতে শেখালো সে মন্ত্র কি বন্দীশালার দেবতাকে পূজা করে খুসী হতে দেয়। যে বিশ্বশরণ তাঁর জগৎ মন্দিরে সমাসীন তাঁকে পেতে হলে জাতের বেড়া তুলে মন্দিরের রুদ্ধদ্বার পূজার অর্ঘ্য সাজালে তো চলবে না। কবির সত্তা তো অত ক্ষীণপ্রাণ নয়, সে মহৎ উৎস থেকে শক্তি পেয়েছে। সেই 'সাবিত্রী'র প্রতিধ্বনি এখানেও শোনা গেল

প্রথম প্রাণের বহ্নি উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।

যে তেজোময়ী লহরী অনির্বচনীয়ের স্পন্দন এনে দেয় সে কি কবিকে কোন সংকীর্ণতার আবরণে বাঁধা থাকতে দেয়। কবির মনে সেই পরম অনুভূতি আসে যে, একদা কোন অতীতকালে সৃষ্টির প্রথম দিনে তাঁর সত্তা বিলীন হয়েছিল ঐ সৃষ্টির আদিকেন্দ্রে,

প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।

সেই অব্যক্ত সত্তা জেগেছে দিনে দিনে। সৃষ্টির আলোকতীর্থে তাঁর ভবিষ্যৎ জ্যোতি হয়ে সুপ্ত ছিল তাই প্রতিদিনের জেগে ওঠাই তাঁর পূজা। তাই তো রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের পূজা নীতিবন্ধনে বাঁধা পড়লো না। অনাদি-কাল আগে যার সত্তা ছিল সূর্যের বাষ্পদেহে বিলীন কি করে সে সত্য বলে মেনে নেবে রুদ্ধদ্বার দেবপূজার মন্দিরকে। তাইতো আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সৃষ্টির প্রথম রহস্য, সে আসে আলোকের অমৃত নিয়ে।

তাই রবীন্দ্রনাথ সূর্যসনাথ। যে মন্ত্র অকারণে জল এনে দেয় চোখে সেই মন্ত্র কি আশ্চর্যভাবে সার্থক তাঁর জীবনে। জীবনের কবি জীবনের তেজোময় কেন্দ্রকে কি অপূর্ব বন্দনা করেছেন। প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বত্থ গাছ, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথগাছ
সূর্য-মন্ত্র-জপ করা ঋষির মতো।

সে মন্ত্র যেমন প্রাণে চঞ্চলতা দেয়, আবেগে ভরে, তেমনি ঐ একলা অশথের মতো শান্তি দেয় স্থৈর্য দেয়।

জীবনে যে আদর্শ যে মহত্তের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন তাকে তাঁর ক্ষণিক আনন্দ মুহূর্তগুলিতেও সুরে ধরে রেখেছেন। প্রভাতসূর্য রুদ্রসাজে তাঁর কাছে আহ্বান পাঠায়, সেই আহ্বান কবিকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। প্রভাত আলোর সুরে কবি নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন, সুরের মূর্ছনায় আবেদন ধ্বনিত হয়েছে 'বাজাও আমারে বাজাও'। আলোকের ঝরণা-ধারায় নিজেকে দীনতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত করেন। নিজের ঘুমন্ত সত্তাকে জাগানোর জন্যে কবির প্রার্থনা—'অরুণ আলোর সোনার

কাঠি ছুঁইয়ে দাও।' আলোকে যখন দৃষ্টি ফোটে তখনই কবি বলেন —'ধন্য হল অন্তর।'

বৃক্ষবন্দনা করেছেন যেখানে সেখানেও না বলে পারেন নি যে, যে তেজ দান করে বনস্পতি মানুষকে ধন্য করেছেন সে তেজ সবিতার দান। যে আলোক সারাদিন আকাশ পরিক্রমণ করে, তারই দীপ্তিতে সুন্দর হয়ে বনস্পতি সুন্দরের সাধনা করেছে—কবি তাঁর গভীর সৌন্দর্যের অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে সেই প্রথম সুন্দরের রেখাচিত্র যখন ধূসর পৃথিবীর পটভূমিকায় আঁকা হলো তখন প্রাণের বন্যা এসেছিল ঐ আলোক ধারা থেকেই। সূর্য শুধু প্রাণের কেন্দ্র নয় রূপের কেন্দ্রও বটে।

সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।

(বনবাণী : বৃক্ষবন্দনা)

বিশ্বের সব কিছুকেই শুধু রূপ নয় প্রাণও দিয়েছে সূর্যালোক, তাই ওই বনস্পতি যে মঙ্গলের অর্ঘ্য দিয়েছে মানুষকে বার বার, তাকে কবি বলেছেন,

ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিন ধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী; (বৃক্ষবন্দনা)

'যাত্রী'তে কবি সূর্যপ্রণামের সকল মন্ত্র একসঙ্গে বলেছেন। "সূর্যের আলোর ধারা আমার নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে…সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে"—এই কথাই পত্রপুটে বলেছেন—

সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ। (পত্রপুট : ১৫)

'যাত্রী'তে কবি বলেছেন, "আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী।" পত্রপুটে বলেছেন,

তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু।

'যাত্রী'তে বলেছেন যে সূর্যের জ্যোতি 'বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে';—তাই তো তিনি অশথ গাছের তুলনা পান সূর্য মন্ত্র জপ করা ঋষির সঙ্গে।

ভারতবর্ষ প্রার্থনা করেছে—'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ', অন্ধকার থেকে নিয়ে যাও আলোয়। প্রাচীন ভারতের মন্ত্র কবি নিয়েছিলেন মহর্ষির শিক্ষার আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে। তাই তো সূর্যসনাথ কবি বার বার আকুল হয়ে বলেন—"আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।'

সূর্যালোকের আশীর্বাদ কবি শেষ জীবনেও পেতে চেয়েছেন। গাছের পাতায় ঝলমল করা রোদ তাঁর নিতান্ত প্রিয় ছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন "সূর্যোদয়ের ন্যায় সূর্যাস্তের দৃশ্যও কবির বিশেষ প্রীতিকর ছিল। তাঁহার শয়ন-কক্ষের পূর্বপশ্চিম দুইদিকই এইজন্য অবাধ মুক্ত থাকিত। বিকালে কঙ্করকুঞ্জের হিমঝুরি গাছের তলায় পায়চারি করিতে করিতে তিনি আপনার উপমা দিয়া বলিয়াছিলেন 'গাছগুলিতে সূর্যাস্তের আলো পড়ে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। পাতা ঝরবার সময় এলো সব পাতাগুলি হলদে টসটসে হয়ে আছে, তাতে আবার সূর্যের আলো কি চমৎকার মানিয়েছে। আমারি মত, ঝরে পড়বার আগে গায়ে অস্তরবির রশ্মি পড়েছে। যৌবনের চাইতে এর বাহার কি কোন অংশে কম।"

মৃত্যুর বছর খানেক আগে কবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন দেহের গ্লানিকে জয় করবার জন্যে কি দুরন্ত প্রচেষ্টা তাঁর। রাত্রিতে যে অসহ্য বেদনা দেহকে পীড়িত করে কবি তার থেকে মুক্তি চেয়েছেন সকালের সূর্যালোকে—

হে প্রভাত সূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত,
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও
পরাভূত রজনীর অপমানসহ। (রোগশয্যায় ১৫)

কোন আদিকাল হতে

আমাদের এই জীবন একি শুধু আমাদেরই হাসিকান্নায় ভরা কয়েকটা বছর—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। তার পর? তারপর কি কিছুই নেই? অনন্ত শূন্য থেকে আবার অনন্ত শূন্যে। অত্যন্ত বাস্তব জীবনের এই কটা দিনের আগে পিছনে কি আর কোথাও কোন কিছু নেই। এই জীবনব্যাপী সাধনা, আশাআকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের সমস্যা এর কি কোন যোগাযোগ নেই এই বিরাট জীবন প্রবাহের সঙ্গে। এ প্রশ্ন মনে ওঠে। জীবন বলতে তো শুধু আমার বেঁচে থাকার কটা দিন নয়, প্রাণের যে অবাধ গতি চলেছে চতুর্দিকে, প্রকৃতির মধ্যে, প্রাণীর মধ্যে, মানুষের মধ্যে তার সবটা মিলিয়েই তো জীবন। সেই বৃহৎ বিশ্বের, সুদূর কালের পটভূমিকায় জীবনের রূপ সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

যে জীবনটুকু ভোগ করছি এ আর কতটুকু—কিন্তু সত্যিই কি এর ব্যাপ্তি এখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথ এর অন্য অর্থ করেছেন। জীবন চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে, তার বিরাট প্রবাহে আমরা তরঙ্গের মত, উঠি আর মিলিয়ে যাই। যতদিন থেকে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণের শিহরণ ততদিন থেকেই জীবন চলছে। সৃষ্টির এই সুদীর্ঘকালের লীলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন রহস্যের অপূর্ব সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বহু কবিতায় ও গানে, প্রবন্ধে এই জীবন রহস্যের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। তাঁর জীবনে সুদীর্ঘ ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে এই কথাটি একটি অস্ফুট ইঙ্গিত থেকে একটি গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। পরিণত সেই চিন্তার তত্ত্বটি তাঁকে বুঝতে সাহায্য করবে।

সংসারে আমরা কেউ আকস্মিক নই, ভুঁইফোড় নই। আমাদের জন্মের কারণ আছে, পুত্র মাত্রেরই পিতা আছেন। বিনা অনুসন্ধানেই

নিঃসংকোচে বলা যায় যে পিতারও পিতা আছেন—তাঁরও পিতা আছেন। কল্পনাকে যদি ক্রমাগত দূর হতে দূরতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে মানবের আদি পিতাও স্বয়ম্ভূ নন। ডারুইন তত্ত্ব না জেনেও বলতে পারা যায় যে আদি মানবেরও পিতা ছিল তার রূপ যতই অমানবীয় হোক না কেন। সে কোন প্রাণীর রূপ হতে পারে, যে প্রাণী আরও যুগযুগান্তর আগে হয়তো ছিল তৃণ, হয়তো তরু, হয়তো বিলীন ছিল মাটির জঠরে। এই যে জীবনের ধারা যার সুরু জানা নেই, আমরা তারই অঙ্গ, সেই স্রোতের তরঙ্গ। ছিন্নপত্রের তরুণ কবি বলছেন :

"একসময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়তো, স্থর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো, আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎস্থর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকতো, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে (আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত স্থর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"

এ অবস্থা সৃষ্টির আদিমকালের অবস্থা, তখনও পৃথিবীর শ্যামল অঙ্গের রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে; সদ্যোজাত পৃথিবীর বুকের ভিতর তখন একটি আনন্দ রসের স্রোত জেগেছে, সেই রস ধারা মাটির মধ্যে, হয়তো বা পঞ্চভূতের মধ্যে আমাদের প্রাণের উৎস ছিল। যে চেতনার প্রবাহ আজ আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে সেই চেতনা ছিল ঘাসে এবং গাছের শিরায়। সংবেদনশীল মন অনুভব করতে পারে

সেই আদিম পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রের রোমাঞ্চ, নারকেল গাছের পাতার কম্পনের সঙ্গে আজকের আবেগবিহ্বল মানব হৃদয়ের উৎকণ্ঠার যোগ নেই এমন কথা কে বলবে! ছিন্নপত্রের আরও একটি চিঠিতে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সেই আদিকালের ঘনিষ্ঠতার কথা কবি বলেছেন। শুধু আদি মানব নয়, কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত প্রাণ নয়, জড় পৃথিবীর সঙ্গেই একদিন সমস্ত প্রাণ লীন হয়ে ছিল। সেই দিনের কথা কবির কল্পনায় ভেসে ওঠে, ভাবনায় ফুটে ওঠে তার ছবি।

> "বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর-তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে মস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম।"

আজও কবির চেতনার মধ্যে সেই অতীত পরিচয়ের অস্পষ্ট আভাস ভেসে আসে কোন্ দূরাগত ধ্বনির ঝংকারের মতো, কোন্ বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মতো। এই কথাই ছন্দের সুরে বেঁধেছেন 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। জীবনধারার এই অবারিত প্রবাহ কোন বুদ্ধিগত তত্ত্বমাত্র নয়, এর জন্ম তাঁর উপলব্ধিতে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ কবি লিখলেন অহল্যার প্রতি। এই কবিতায় যে অহল্যা শাপমুক্ত হয়ে জেগে উঠেছে সে ছিল মাটির সঙ্গে বিলীন। তাকে কবি প্রশ্ন করেছেন, মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে কি জানতে পেরেছে পৃথিবীর মহাস্নেহ—

> জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা
> মাতৃধৈর্যে মৌনমুখ সুখদুঃখ যত
> অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
> সুপ্ত আত্মা মাঝে?

পাষাণী অহল্যার বক্ষে জীবধাত্রী জননীর বেদনা বেজেছিল কিনা এই হলো কবির প্রশ্ন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিগূঢ় যোগ দেখিয়েছেন এবং ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে আমাদের মনুষ্যত্বের যে বোধ আমাদের বিরাট বিশাল পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সে বোধ 'সংস্কার মাত্র নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ। প্রকৃতি রাজ্যে এ বোধের স্থান মাত্র নেই।'

মানুষমাত্রেরই মনে হাজার হাজার সংস্কার ছড়ানো আছে। যারা সাধারণ তাদের সচেতন সংস্কারগুলো তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। যারা অসাধারণ তাদের অবচেতনে জেগে ওঠে যে সব সংস্কার তার প্রভাব শুধু তাদের জীবনে নয়, দূরবর্তীকালে ও অন্যান্য জীবনেও বিস্তৃত। জীবনের এই অখণ্ড দেশকালব্যাপী বিরাট রূপ রবীন্দ্রনাথের কোন্ সংস্কারকে আশ্রয় করেছিল যার ফলে তাঁর এই সম্যক্‌দৃষ্টির উদ্বোধ সম্ভব হল, প্রতিভার সে গূঢ় গোপনতত্ত্ব আমাদের জানা নেই।

চেতনার এই অনাদি অনন্তকালের প্রবাহ যা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার সম্বন্ধে আমাদের বোধ জেগে ওঠে যখন, তখন বুঝি আমাদের জীবন বিচ্ছিন্ন নয় এবং এ জীবন একটা দুর্ঘটনা নয়। ডারুইন, ফেকনার, বার্গসঁ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে কবির এই গূঢ় অনুভূতির নিকট যোগ দেখিয়েছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। সৌরজগতে পৃথিবীর যে উন্মাদ নর্তন তার সঙ্গে কি আমাদের যোগ নেই! যেদিন এই পৃথিবীর ধূলিকণার মধ্যে আজকের আমি লুকিয়ে ছিলাম সেদিন অবিশ্রান্ত ছন্দের যে গতি ছিল তার সূর্যমণ্ডলে তার স্মৃতিও কবির ধ্যানে আসে—

তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন

যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুলফল গন্ধরেণু। (বসুন্ধরা)

'অহল্যার প্রতি'তে যা প্রশ্ন 'বসুন্ধরা'য় তা ঘটনা যা সহজে মনে পড়ে, যার সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নেই। 'সমুদ্রের প্রতি' আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল যদিও কাব্য হিসাবে তা ত্রুটিহীন নয়। এ সমুদ্র পৃথিবীর জননী। এর ভুবন ভ্রূণের মধ্যে ছিল প্রাণ যে অনুভব করে তার চতুর্দিকে তরঙ্গের দোলা। এখানে কবি সবেগে বলেছেন "নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ঐ ভাষা জানে আর কিছু শেখে নাই।" এ প্রশ্ন নয়, এ স্মৃতি নয় এ বর্তমানের ঘোষণা।

ভালবাসার গৌরব ঘোষণা করতে গিয়ে আমরা বলে থাকি প্রেম জন্মজন্মান্তরের। কত নায়কনায়িকা পরস্পরকে বলেছে যে তাদের প্রেম গত জন্মের এবং পর জন্মেও তার ক্ষয় নেই। যে ভালবাসার ব্যাপ্তি নেই তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ভালবাসার সেই দিগন্তপ্রসারী বিস্তারের স্পর্শ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন ঐ অনাদি চেতনার তত্ত্ব দিয়েই—

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কতযুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি। (উৎসর্গ : ১৩)

এমনি করে ভালবাসা ছড়িয়ে গেল কোন্ দূর যুগে, যেখানে প্রাণে ভরা মাটির মধ্যে দুজনের নিত্য মিলন ছিল।

এই যে ধারণা এ শুধু কবির উচ্ছ্বাস নয়, এ তাঁর গভীর বিশ্বাস। স্টপফোর্ড ব্রুক কবিকে এ প্রশ্ন করেছিলেন যে জন্মান্তর তিনি মানেন কিনা। তার উত্তরে কবি বলেছিলেন, "আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই পারে না, যে আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানব-জন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস।" (স্টপফোর্ড ব্রুক)

'সেঁজুতি' কাব্যে 'যাবার মুখে' কবিতাটি বিদায় ব্যথার রসে ভরপূর। এ জীবন যে অসীম জীবনের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ কবি তা বার বার বলেছেন। এই প্রকৃতির যা কিছু রূপ, যা কিছু রং সব কিছুর মধ্যেই প্রাণের অনাদি প্রবাহকে কবি অনুভব করছেন। এখন এ আর শুধু একটা রোমান্টিক ধারণা নয় এখন একটা গভীর মিষ্টিক বিশ্বাসে তা পরিণত হয়েছে

ওই যে শিমুল ওই যে সজিনা
আমারে বেঁধেছে ঋণে,—
কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে থাকা
মধুর মৈতালিতে
নীল আকাশের তলায় ওদের
সবুজ বৈতালিতে।
সকাল বেলার প্রথম আলোয়
বিকেল বেলার ছায়ায়
দেহ প্রাণমন ভরেছে সে কোন
অনাদিকালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।

'রোগশয্যায়' কাব্যে আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার সামনে দাঁড়িয়েও ভয়হীন

জীবন-বিশ্বাসী কবি প্রাণের বিপুল বিরাটত্বকে মেনে নিয়ে বলছেন যে চেতনার কোন সীমা নেই। অনন্তকালে তার প্রসার। সেই প্রসারিত চেতনার সীমাহীন দিগন্তের স্বাদ বুকে ধরে আমরা বেঁচে আছি কণিকাবিন্দুর মতো—তাই অতি ক্ষুদ্র আমরা সেই পরম বৃহতের অংশীদার—

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।

(রোগশয্যায় : ২৮)

আর বলছেন আরোগ্য কাব্যে—

এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক (আরোগ্য : ৩২)

এই মহাজীবনের বাণী দিনে দিনে তাঁর কাব্যে শোনা গেছে—প্রথমে যা ছিল তত্ত্ব পরে তা জীবনের রসে ভরা আনন্দ উপলব্ধিতে পরিণত হল।

চেতনার ও জীবনের এই পূর্ণতা, যা সৃষ্টির আদি থেকে কোন অজানার উদ্দেশ্যে একটি অখণ্ড ধারায় চলেছে তারই কথা কবি গানে বল্লেন—

জানি জানি কোন আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

তবু মনে রেখো

এই যে পৃথিবী, এই যে রঙ, এই যে সুরের বৈচিত্র্য, এই যে শরৎ শিশিরে ছলছলিয়ে ওঠা বনাঞ্চল, যাকে এতদিন ধরে ভালবাসা গিয়েছিল তাকে ছেড়ে যেতে হবে। সুদূর দিগন্তে অস্তগামী সূর্য বিদায় বেদনার রক্তিম আভাসে গোধূলিবেলাকে বিধুর করে তুলেছে—সেই বিধুরতা আকাশ ছেয়ে মনকে উদাস করেছে। ঝরা বকুলের দল ডাক দিল নক্ষত্রলোকের সভায়—পূরবীর বিষণ্ণতা মন ভরে তুলেছে, যাত্রীর যাত্রা জীবনের রাজপথে প্রায় শেষ হয়ে এলো। কবির মনে বেদনার অন্ত নেই। যা দেখলুম এতদিন ধরে, যত কিছু ভালোবাসলুম সব ছেড়ে যেতে হবে। দুদিন পরে সবই থাকবে। এমনি করেই ফুল ফুটবে, এমনি করেই বর্ষার আকাশ ভরা মেঘ থমথম করবে, এমনি করেই গোরু চরবে শুধু আমিই থাকবো না, বিশ্বলোকে ফাঁক পড়বে না কোথাও। বুদ্ধির কোন বাঁধনেই মন বাঁধা মানলোনা, তারার বিষণ্ণতায় ভরা বুক নিয়ে কবি শুধু বলে গেলেন 'তবু মনে রেখো।'

জীবনের শেষ দিনগুলিতে ঐ কথা বার বার বলেছেন। জীবনের প্রতি ছিল অসীম মমতা আর সুগভীর অনুরাগ। তাই ছেড়ে যাওয়ার কথা যখনই মনে হয়েছে তখনই বলেছেন যে নিজেকে তিনি রেখে গেলেন তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে, তাঁর সৃষ্টিতে। বলেছেন, যে যা কিছু অনুভব করেছিলেন সব রেখে গেলেন আর তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে রেখে গেলেন নিজেকে। যা দিয়ে গেলুম তা হয়তো অতি সামান্য যা রেখে গেলুম কালের জয়টীকা হয়তো তার ললাটে পড়বে না কোনদিনই। কিন্তু তবুও বাসনা আছে যে শতাব্দীপারের বাতায়নবাসিনী যেন তার বিরহের

সান্ত্বনা আমার কাব্যে পায়, তার বসন্ত দিনে আমার এই বসন্তগান যেন ক্ষণিকের জন্যও ধ্বনিত হয়। আর যদি কখনো অন্যসুরের দিন আসে, অন্য কবির আসরের সপ্ততন্ত্রীবীণায় ,আমার আজকের সুর যদি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে, 'যদি পড়িয়া মনে ছলছল জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে —তবু মনে রেখো।'

কিন্তু এ কথা রবীন্দ্রনাথের নতুন নয়। নতুন যে নয় তা তিনি নিজেই বলে গেলেন। যুগে যুগে' কালে কালে সরস্বতীর ভক্তের দল কিন্তু ঐ একই কামনা অন্তরে পোষণ করে এসেছেন। কথার মালা গেঁথে ঐ একটি কথাকেই সযত্নে বুকের মধ্যে লালন করে এসেছেন—'তবু মনে রেখো।' সেই প্রথম দিনে যেদিন আকাশে মেঘ উঠেছিল আর বিরহিনী প্রিয়া অন্তরে অনুভব করেছিল তার প্রথম ব্যাকুলতা তার সঙ্গে আজকের বিরহিণীর সুর তো একই ছন্দে বাঁধা। প্রথম বাংলা কাব্যের অরুণোদয়ের যুগে কবি লিখেছিলেন,—

সো মহাকান্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চেলাএ।

আমার সেই কান্ত আজ দূর দিগন্তে। বর্ষা এসেছে, চিত্ত আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বর্ষণক্লান্ত দিনে বিরহিনীর সেই ব্যথা কিন্তু পুরানো হলোনা আজও। হাজার কবির মনের মাধুরী মিশে সেই ব্যথা সেই একই কথাকে নতুনতর করে রূপে রসে ফুটিয়ে তুললো। ঘন শ্রাবণ রাত্রে ঘন দেয়া গরজনের মধ্যে বৈষ্ণব কবি তো ওই বেদনার রাজপথ দিয়েই তাঁর একতারা বাজিয়ে গেলেন। ঝরঝর মুখর বাদর দিনে কিছুতে কেন যে মন লাগে না—এই অতৃপ্তি দিনে দিনে ব্যক্ত হলো। তবু পুরানো হলোনা।

বক্তব্য যাইহোক, ওই বেদনা যখন কবি চিত্তের সমস্ত দুয়ারগুলো ধরে নাড়া দিচ্ছে তখন কবি শুধু এইটুকুই ভেবেছেন যে এই অনুভূতি এই ভাবনার চেয়ে সত্য কি কিছু আছে। বাইরের জগৎ কবির মনের ওই এক মুহূর্তের

সোনার কাঠি ছোঁয়ানো জগতের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কেবল এই কথাটাই অহরহ আর সব সুরকে ছাপিয়ে বাজতে লাগলো যে এই বেদনা যা আজ আমারি বুকে বেজেছে একি আর কেউ জানবে না? এই সুর এই তান একি আর কখনো বাজবে না? অনন্তের মহাশূন্যে একি নিঃশেষে হারিয়ে যাবে? সেই বেদনাতেই কবির হাতে লেখনী নেচে ওঠে, সুর ঝরে পড়ে, রূপ ফুটে ওঠে। আমার বেদনাটি বেঁচে থাক, অন্তরে অন্তরে সুর তার অনুরণিত হোক—এই বাসনার তাগিদ এই বহুজ্ঞাত সত্যের পুনর্কথনের ভিতরকার রহস্য।

সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে মানবচিত্তে স্থান লাভের প্রেরণা আছে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার জোর করে বলেছেন। শুধু তাত্ত্বিক প্রবন্ধের কাঠামোয় নয় তাঁর কবিতায় হাজারবার বলেছেন—আমি আছি, আমি আছি এই হলো সৃষ্টির পিছনের কথা। 'আমারই চেতনার রঙে পান্না উঠলো সবুজ হয়ে।' লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে গাঁথা হয়ে থাক যে একদিন আমি ছিলাম, আমি যে দুলেছি এই বিশ্বের হাসিকান্নার দোলায়, ভালবাসা প্রেম আর অনুরাগ নিয়ে। জীবন তো অচেনা ছিল না, তার সুর তো বেগানা সুর ছিল না, তাই যা দেখলুম দুচোখ ভরে, দুকানে যা শুনলুম, স্পর্শ করলুম যা কিছু —সব ছেড়ে যেদিন চলে যেতে হবে সেদিন চাওয়াটা কি সত্যিই খুব বেশি হবে, যদি বলি 'তবু মনে রেখো।'

যা ছিল তত্ত্বকথা, তা হোল কাব্য। যা ছিল ভাষা তা হলো সুর। এমনি করে তিনি তাঁর সব কথা ধরে নিয়ে গেছেন তাঁর সুরের মধ্যে। বারবার আঘাত এসেছে, বাধা এসেছে, মন তাকে অতিক্রম করে জয় পরাজয়ের অতীতে নিয়ে গেছে সাধনাকে। আগামীকাল সুদূর ভবিষ্যৎ যেন আমাকে না ভোলে শুধু এইটুকুই চাওয়া। সন্ধ্যা যখন গভীর হয়ে আসে, যখন পূরবীতে সুর করুণ ক্লান্তি নিয়ে বেজে ওঠে, অতিক্রম করে সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত মানব-মনের আকাশ জুড়ে সেই গভীর বাসনা হৃদয়ের দুয়ারে দুয়ারে আঘাত করে যায়—তবু মনে রেখো।

এই জন্যেই যাঁরা তত্ত্বকথা বলেন মানুষের ইতিহাসে জায়গা পেলেও মানুষের মনে তাঁদের জন্য জায়গা কই। যে তত্ত্ব আজ চমক লাগায় কাল

সে তত্ত্ব গতানুগতিক বর্ণহীন বিবৃতিমাত্র। যে তত্ত্বকার আজ সংবাদপত্রের উচ্চচূড়ে প্রশংসিত কাল নবীনতর তাত্ত্বিকের প্রচণ্ড দাপটে সে অবলুপ্ত। বর্তমান তাদের যে মূল্যই দিক ভবিষ্যত তাদের ভুলে যাবে। রাজনীতির আসরে যাঁরা বর্তমানের সমস্যা সমাধানে রত, মানবসমাজের চিরন্তন মূল্যগুলিকে যারা সাময়িকতার সংকীর্ণতার দ্বারা খণ্ডিত করেছেন নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী তাদের কেন স্মরণ করবে?

এই একই কথা সেই সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে, যাঁরা লোকের দাবি মেটাবার চেষ্টা করেছেন, কালের দাবি হাতে হাতে মিটিয়ে যাঁরা লোকরঞ্জক হয়েছেন। এ কাল চলে যাবে, এই মানুষের দল চলে যাবে, এদের সাময়িক ভালমন্দ লাগা ফুরিয়ে যাবে। তখন কে মনে রাখবে? যদি আজকের লেখার সুর কাল না বাজে তবে কালকের মানুষ কেন এই বিগত দিনের বোঝায় মনকে ভারী করবে।

তাই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, জ্ঞানের কথা নয়, ভাবের কথা নিয়েই সাহিত্য; তাই জন্যেই বলেছেন যে তাৎক্ষণিক ও তৎসাময়িককে যে সাহিত্য অতিক্রম করতে পারলো না তার ঠাঁই নেই। যাঁরা যথার্থ স্রষ্টা পাঠক সমাজের রুচি ও ইচ্ছার দ্বারা তাঁদের রচনার চরিত্র নির্ধারিত নয়। সহজে মন ভোলানোর পথটা তাঁরা গ্রহণ করেন না। মানব চিত্তকে জাগিয়ে তোলাই যখন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাজ তখন প্রয়োজন মত সুখনিদ্রা ভাঙ্গাতে, আঘাত করতেও তাঁদের এগিয়ে আসতে হয়। রবীন্দ্রনাথ জনচিত্তের তালে তাল মেলাবার কবি নন, 'জনসাধারণ' তাঁর কাছে দেবতা নয়। তিনি বলেছেন,—"সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই যোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি।......যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই।......যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই।" (আত্মপরিচয়: ২)

এই যে রবীন্দ্রনাথ যিনি সমসাময়িক কালের দাবির কাছে নিজেকে খর্ব করেন নি তিনিই সর্বকালের কবি—তিনি সকল কালের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রতিভূ। এই শিল্পীর কণ্ঠেই ভবিষ্যতের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবার দাবি মানায়—কারণ তাঁর বাণীতে আছে সর্বকালের বাণী। কোন একটি বিশেষ যুগের, বিশেষ উত্তপ্ত আবহাওয়া তাঁর বাণীকে ক্ষীণজীবী করেনি। তাই তাঁর অনুভূতি, তাঁর কথা, তাঁর গান সহজেই পরবর্তী কালের মানুষের কাছে সত্য হয়ে ওঠে। যা চিরকালের, মানুষ তাকে তাঁর কাব্যে খুঁজে পায়।

যে রবীন্দ্রনাথ অন্য মানব হৃদয়ে স্থান পাবার জন্য এত ব্যগ্র তিনিই আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, "যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি-সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধুলা দেয় তবে সেই ধুলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্ধনা।" (আত্মপরিচয় : ২)

এই রবীন্দ্রনাথই বলছেন, 'তবু মনে রেখো।' কাকে বলছেন—শতাব্দী পারের বাতায়নবাসিনীকে, কুসুমিত তরুতলে অশোকচয়নী তরুণ-তরুণীকে। খ্যাতিকে তিনি দূর থেকে সংকোচের সঙ্গে এড়াতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন খ্যাতির চূড়ান্ত পরিণাম শিশুপাঠ্য কাহিনীতে কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ মাত্র। খ্যাতির মুকুট খুলে তিনি সাধারণের হৃদয়ের কাছে আবেদন করেছিলেন প্রীতির, বন্ধুত্বের। তিনি বলেছেন, "খ্যাতির কথা থাক। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সংকোচন-প্রসারণ নিয়ে যে মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হতে থাকে সে অভিশপ্ত।"

তাই খ্যাতি নয় প্রীতি, সম্মান নয় ভালবাসা ছিল রবীন্দ্রনাথের চাওয়া। কি অপরিসীম ছিল এই পৃথিবীর প্রতি তাঁর ভালবাসা। তিনি কতবার বলেছেন,—"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হলোনা, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি।" তাই রাজসম্মান তাঁর কাম্য ছিল না, ঐশ্বর্যের প্রলোভন তাঁকে বিচলিত করেনি, তিনি বল্লেন—

শেষ স্পর্শ নিয়ে যবে যাব ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
(আরোগ্য : ১)

এই মাটির তিলকের কথা আরও অনেকবার বলেছেন—এ হলো প্রীতির চিহ্ন, মর্তরসের ছোঁওয়া রয়েছে তাতে।

রোগশয্যায় কাব্যের একটি কবিতায় মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে কবি কল্পনায় দেখেছেন, ভবিষ্যৎ কালে যখন তিনি নেই, তখনও এক পথচলা পথিক তাঁর কথা ভাববে। আজকের দিন ফুরিয়ে গেলে যখন শুধু গুঞ্জনটুকু থাকবে তখন কোন কর্মক্লান্ত পথিক পথের ধারে এই রাগিণীর করুণ আভাসের স্পর্শ পাবে—

নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নীচু
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে
বুঝিবে না আর কিছু—
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি। (রোগশয্যায় : ১০)

কীর্তি অবিনশ্বর নয়, সে একদিন যাবেই কিন্তু পৃথিবীর প্রতি তাঁর এই অসীম ভালবাসা থাকবে চির নবীন—

আমি জানি যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি। (রোগশয্যা : ২৬)

এই ভালবাসা শিশুর মত সরল ছিল। কবির অভিমানী মন মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মনে পড়ছে সেই আশ্চর্য জীবনরসসিক্ত গানটি 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' কি প্রচণ্ড অভিমান, যখন থাকবোনা,

চলবোনা এপথ দিয়ে, এই ঘাটে বাইব না খেয়াতরী তখন যদি ভুলে যাও তবে একদিনের জন্যে হঠাৎ ক্ষণিকের খেয়ালে—'তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।' এত ভালবাসা, এত নিকট নিবিড় সান্নিধ্য এ সবই শুধু ঐ তারার দিকে চেয়ে ডাকায় অবসিত! অভিমানী কবি তাই বল্লেন 'নাই বা আমায় ডাকলে'। হায় স্নেহকাতর কবি, এ অভিমান তার কতক্ষণের। ভালবাসাকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করে তোলার জন্যেই তো অভিমান। পরমুহূর্তেই কবি বললেন "তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।"

আমাদের মত সাধারণ অনুভূতির মানুষও এই কথা ভাবতে ব্যথিত হয় যে এই আলো, রং, সুর, গন্ধভরা পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে। সবই থাকবে, প্রতিদিনের সূর্যোদয় দিগন্তের বুক রাঙিয়ে দেবে, প্রতিদিনের গোধূলি আলোছায়ার বিচিত্র জাল বুনবে, সূর্যচন্দ্রতারকার প্রচণ্ড সমারোহের তলায় মানবজীবন রঙে রসে আবর্তিত হবে। এই পরিচিত সংসার দুদিনের মধ্যেই আমার অস্তিত্বকে ভুলবে। যারা সাধারণ মানুষ এই বোধ যদি তাদেরও মনে ব্যথা আনে, চোখে জল আনে তাহলে সেই পরম সংবেদনশীল কবি মানুষের মনে কি বিপুল ব্যথার তরঙ্গ উঠেছিল! তাই তো বার বার নিজের ভালবাসাকে এত কথায় প্রকাশ করেছেন, কেবলই জানিয়েছেন—তবু মনে রেখো—আমাকে গ্রহণ করো না করো, স্বীকার করো না করো—তোমাদের এই হাসিখেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম, এই কথাটি মনে রেখো।

আজি মম জন্মদিন

যেদিন আমরা প্রথম এসেছি এই পৃথিবীতে সেদিন কোন আসক্তির জাল দেহে মনে জড়িয়ে নিয়ে আসিনি। তারপর থেকে দিনে দিনে সংসারের ধূলিধূসরতায় নানা আসক্তির বাঁধনে জড়িয়ে পড়ি। এই পৃথিবীর রূপরস গন্ধ ভালো লাগলো, ভালো লাগলো তার সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, তার আকাশ তার তৃণতরু, তার কোমল মানব হৃদয়গুলিকে। সেই ভাললাগায় মন জাগলো, বোধ জাগলো, সূর্য উঠলো অনুভূতির আলোকে চেতনাকে উদ্ভাসিত করে। আবার অন্যদিকও আছে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের গতানুগতিক মলিনতায় চাপা পড়ে গেল আমাদের সত্তার সেই আদি পরিচয়—যে পরিচয়ে আমরা সমস্ত বিশ্বের প্রাণধারার সঙ্গে একটি গভীর যোগে আবদ্ধ, যে পরিচয় না পেলে জীবনের মহৎ প্রকাশের ধারণা জাগে না মনে।

আমাদের জীবনের রূপ চিত্রার্পিত তটস্থ ঘোড়ার রূপ নয়। চারটে পা শূন্যে তুলে যে ঘোড়া পটে ধরা পড়েছে সে তার স্বভাবধর্মটিকেই যেন বিদ্রূপ করছে, তার পূর্ণ স্বভাবের প্রকাশ তো পটের ছবিতে নেই, অথচ সেই ক্ষণিকের রূপটাও তো মিথ্যে নয়। আমাদের প্রথম জন্মদিন থেকে যে জীবনের ধারাটি চলেছে তাকে কোন একটা বিশেষ রূপের ছাঁচে ফেলতে তাই রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত আপত্তি। আমি চলেছি মুহূর্তে মুহূর্তে, চলা আমার ধর্ম অথচ আমি যে ক্ষণিকের জন্য থেমে দাঁড়াই এটাও মিথ্যে নয়। সেই থামা আর চলার কাব্য হলো জীবন। নিজের জীবনের সেই চলা থামার ছন্দ মেলাতে মেলাতে কত রকমের ভাবনাই মনে জাগে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই, শুধু মানুষ কেন প্রত্যেক জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যেই একটি গূঢ় চৈতন্য কাজ করে চলেছে—কবি তাকে বলছেন প্রাণ-প্রবর্তনা। নিজের জীবনে সেই প্রবর্তনাকে উপলব্ধি করে কবি বলছেন, 'আজ পিছন ফিরে দেখি যখন তখন আমার প্রাণ যাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি, সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্প ধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলছে।" (জন্মদিনে, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭)

নিজের প্রাণশক্তির এই ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে তাঁর জন্মদিনের কবিতাগুলির মধ্যে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আর বলেছেন এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে তাঁর একান্ত নিবিড় আত্মীয়তার কথা। একটি একটি জন্মদিন এসেছে আর মুগ্ধ কবি আনন্দ বিহ্বল চিত্তে স্মরণ করেছেন, "বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এই জন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগলো আমার।" (জন্মদিনে, প্রবাসী জৈষ্ঠ ১৩৪৭)

নিজের জন্মদিন তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা রবীন্দ্র অনুরাগী মাত্রই জানেন। নিজেকে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ ২৫শে বৈশাখে তিনি করে নিতেন, তাই কবিতায় গানে প্রবন্ধে তার নিত্যনতুন তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করেছেন আনন্দের সঙ্গে। প্রতিবছর যতই বয়স বেড়েছে ততই যেন গভীরতর অনুরাগের সঙ্গে জন্মদিনটিকে নিবিড়ভাবে পাবার চেষ্টা করেছেন নিজের মনে, নিজের অন্তরে। নিজেকে নতুন করে প্রকাশ করবার আনন্দেই এই উৎসবটি তাঁর এত প্রিয়। আশীবছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি বল্লেন, "জানিনে আর কখনো উপলক্ষ হবে কি না তাই আজ আমার আশীবছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। তাই নিজেকে দেখতে হয় অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে।"

১৩১৭ সালে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় বালকদের কাছে এক ভাষণে তিনি জন্মদিনের কথা বলেছিলেন। তাতেই বলেছেন যে বেশ কিছুকাল জন্মদিন সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা তাঁর মনে হয়নি। "কত পঁচিশে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।" তবে প্রিয়জনেরা কখনো কখনো ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করেছেন। সেদিন তাঁদের সেই অভিনন্দনে কবি নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। সংসারের বহুর মধ্যে যে এক, সেই এক নিজে যেখানে একমাত্র সেখানে তাঁর দৃষ্টি পড়তো। ব্যবহারিক জীবনের দেখা শোনা, কথাবার্তার শেষে একটি লক্ষ্য আছে তা হলো নিজেকে জানানো। অন্যদিকে সমস্ত সংসারের সঙ্গে আত্মীয়তার একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন জন্মদিনের উৎসবের প্রেরণা। "আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করছো তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাকো আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তা হলেই এই উৎসব সার্থক।" নিজের চিরন্তন নবীনতা যে কেবলি সকল মালিন্যের আবরণ মুছে নিজেকে প্রকাশ করছে সে কথাও ঐ ভাষণেই বলছেন—"আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নতুনভাবে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।"

১৩২৬-এর ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর ৫৯তম জন্মোৎসব হয়েছিল। জন্মদিন উপলক্ষে কিছু না কিছু সাহিত্যসৃষ্টির সুরু ঐ বছর থেকেই। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। ২৪শে বৈশাখ কবি একটি গানে তাঁর ভাব ব্যক্ত করলেন—"আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়"—তখন থেকেই তাঁর লেখায় ও গানে বিদায়ের সুর জুড়ে দিয়ে কবি মনে করেছেন তাঁর যাবার সময় সত্যি বুঝি কাছে এলো? সেই যুগে সবুজপত্র প্রকাশিত হচ্ছে বিপুল গৌরবে—তার মধ্যে তিনি প্রাণের বিজয়ী মূর্তির প্রকাশ দেখেছেন। সে কথা লিখলেন ৭ই বৈশাখ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

এক চিঠিতে। তাতে লিখছেন, "এই যে এগোবার দিকে চলেছি এখন আমাকে পিছু ডেকোনা। বিধাতা আমাকে বর দিয়েছেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেছে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েছে।" (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)

গানটির মধ্যে নিছক শেষের কথাই নেই। সেখানে নিজের মধ্যে নবীনের আবির্ভাব অনুভব করেছেন। জীর্ণ পাতা শুধু চলেই যায় না, সে নূতনকেও আহ্বান জানিয়ে যায়। জীবনে সেই নবীনের প্রকাশই তো বারবার জীর্ণ পাতার মধ্যে সত্য হয়েছে। গানের প্রথমে তাই বললেন,—

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে॥
তাইতো আমার এই জীবনের বনছায়ে
ফাল্গুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে;

তারপর বিদায়ের সুর একটি রহস্যঘেরা চিত্ররূপের মধ্যে সুন্দর ফুটেছে,—

দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার সেই ফুরালো,
তোমার বাঁশী বাজে সাঁঝের অন্ধকারে—
শূন্যে আমার উঠলো তারা সারে সারে।

১৩২৭ সালের জন্মদিনের কোন কাব্য বা কবিতা পাই না। ১৩২৮ সালে কবি গেছেন জেনেভায়—সেখানে বন্ধুবান্ধব আপন জনেরা কেউ নেই। বাংলার শ্যামল মাটি বা বীরভূমের লালমাটির জন্য অন্তরে তৃষ্ণা নেই এমন নয়। তাই দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লিখছেন, "আজিকার দিন যথার্থভাবে আমার জন্য নহে। যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদেরই আনন্দের দিন। তোমাদের কাছ হইতে দূরে আজিকার এই দিন আমার কাছে পঞ্জিকার তারিখ মাত্র। আজ একটু নিরালা থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই।"

কিন্তু কবির উপায় নেই বল্লেই জার্মানি শুনবে কেন। সমগ্র জার্মানি কবির জন্মদিনে কবিকে সম্বর্ধনা জানালো। কাউন্ট কেইসারলিঙ, রুডলফ্

অয়কেন, টমাস মান প্রভৃতিকে নিয়ে সংগঠিত এক কমিটি কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহ উপহার দিলেন। কবি এণ্ড্রুজকে লিখছেন, "The German greeting and the gift that have come to me from Germany on the occasion of my 61st birthday are overwhelming in their signifiance for myself. I truly feel that I have had my second birth in the heart of the people of that country, who have accepted me as their own."

১৩২৯-এর পঁচিশে বৈশাখ কবি শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মাবকাশ ভোগ করছেন। ভীড় নেই, উত্তেজনা নেই। সে বছর লিখলেন ২৫শে বৈশাখ কবিতা (পূরবী)—পরে কবিতাটির অংশবিশেষ বদলে এটিকে গানেও পরিণত করেন।

নিজের প্রথম আবির্ভাবের গৌরব অনুভব করার চেষ্টা ও আনন্দ থেকে এই কবিতার জন্ম। বারবার ২৫শে বৈশাখ ফিরে আসে, কখনো আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে, তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে, কখনো শুষ্কপত্র বাতাসে উড়িয়ে, মত্তহীন বেগের প্রাবল্য তাঁর সমস্ত সত্তায় সঞ্চারিত করে দিয়ে। আবার কখনো তার প্রশান্ত আবির্ভাবে নীলকান্ত আকাশের থালার পরে ভুবনের উচ্ছসিত সুধার পেয়ালাটিকে দেখে কবির প্রাণ দেবতাকে মনে পড়ে। ভাবকল্পনার আশ্চর্য গভীরতায় এ কবিতা যেমন সমৃদ্ধ তেমনি এর ভিতরের ব্যক্তি হৃদয়ের স্পর্শটুকুও অনুভব করা কঠিন নয়। এই যে পঁচিশে বৈশাখের নানারূপ, কি তার কারণ, কি তার সার্থকতা। আমরা যেদিন প্রথম পৃথিবীতে এসেছিলুম সেদিন তো অম্লান পবিত্র কুসুমের মতোই এসেছিলুম। তারপর বছরের পর বছর সেই কুসুমের দলগুলির উপর ধূলির আবরণ পড়লো, তার রং বিবর্ণ হলো, তার রূপ সেই প্রথম দীপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলো না। জন্মদিন শুধু উৎসবের বিলাসমূর্তি নিয়েই এলোনা। এলো সেই প্রথম অম্লান সত্তাকে পুনরুদ্ধার করার মন্ত্র নিয়ে। সেই প্রথম জন্মদিনকে যদি নদীর উৎসমুখ মনে করা যায় তাহলে একথাও মনে করা যায় যে আজও সেখান থেকে জীবনের স্রোত অজস্রধারায় ঝরে ঝরে পড়ছে—সেই প্রথম জন্মদিন সমস্ত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বদ্ধ, যেমন

নদীর সঙ্গে তার উৎস। এই জন্যেই সেই প্রথম জন্মদিনকে স্মরণ করবার এত ব্যগ্রতা,—

মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন

যেদিন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।

নিজের সকল রিক্ততার দেনা মিটিয়ে জীবনের জয় হোক, প্রাত্যহিকের জড়তার উপর নূতনের প্রকাশ সূর্যের মত দীপ্ত হোক—এই হলো জন্মদিনের প্রার্থনা। এবার সেই বিদায়ের সুরটি নেই। একটি বলিষ্ঠ আত্মউদ্বোধনের সুর এই কবিতার আগাগোড়া ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। নিজের মধ্যে যে একটি অফুরন্ত প্রাণ উৎস রয়েছে তাকেই নতুন করে পাবার জন্যে জন্মদিনের এই উৎসব।

১৩৩০ সালে কবি শিলং-এ গেছেন; পঁচিশে বৈশাখ সেখানেই কেটেছে, কিন্তু ঐ উপলক্ষে কোন উৎসব বা কবিতার সন্ধান নেই।

১৩৩১-এ কবি চীন ভ্রমণে গেছেন, সঙ্গে এলমহার্স্ট সাহেব, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি গেছেন। জন্মদিনের উৎসবের উল্লেখ পাচ্ছি কিন্তু কবিতা নেই। তবে পরবর্তীকালে এই চীনবাসের পঁচিশে বৈশাখকে স্মরণ করে কবিতায় লিখেছিলেন,—

একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে…
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। (জন্মদিনে : ৩)

কবির জন্মদিন শুধু পাঁজির পাতায় ২৫শে বৈশাখ হয়েই নেই। যেখানেই নিজেকে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ হয় সেখানেই জন্মদিন। জীবন যেমন তাঁর কাছে স্থবির গতিহীনতা নয়, তাঁর জন্মদিনও তেমনি অচল অনড়

নয়। মনের ভিতরে কেবলি সেই জন্মদিনের নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। ঐ কবিতাতেই বলেছিলেন,—

জন্মবৎসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ একথা রহিল মোর মনে। (জন্মদিনে : ৩)

১৩৩২-এ কবির জন্মদিন বিপুল আয়োজনের মধ্যে সম্পন্ন হলো। সেইদিন পঞ্চবটির প্রতিষ্ঠা হলো শান্তিনিকেতনে। এ বছরেও কোন নতুন কবিতা নেই। 'পঞ্চবটি' উপলক্ষে গান লিখেছেন—'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ'। মনে মনে নিজের অতীতের সঙ্গে একটি স্নেহের যোগ অনুভব করছেন—যে যোগ অস্তোন্মুখ সূর্য অনুভব করে তার উদয়মুহূর্তের সঙ্গে। একদিন যখন জীবন ঘরের লোকদের স্নেহের কেন্দ্রে আবর্তিত হচ্ছিল তখন জন্মদিনের উৎসব ছিল একরকম আর বাইরের সংসারে যখন দ্বার খুলে গেল তখন যারা 'পর' তাদের দাবি বড় হল—কবির ডাক এলো তাই 'পর লোকে'। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে (চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড) কবি বলছেন—"এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন একসময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়লো সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মতো। সেই আমার নবজন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেছে। যেটাকে আমার জন্মান্তর বল্লুম তাকে আমার পরলোকও বলা চলে। অর্থাৎ যারা পর ছিল তাদের মধ্যেই একদিন আমার অভ্যর্থনা সুরু হয়েছিল। তোদের লোক থেকে এই লোকান্তরগতকে তোরা হয়ত স্পষ্ট করে দেখতে পাসনি। যে ঘাট থেকে জীবনযাত্রা প্রথম সুরু করেছিলুম আমার কাছেও মাঝে মাঝে তা ঝাপসা হয়ে আসছিলো। কিন্তু এটা হলো মধ্যাহ্নকালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানী সুর হাওয়ায় বেজে উঠেছে। আলো কমে এলো। এখন দেখতে পাচ্ছি ভোরবেলার আর গোধূলিবেলার একই গোত্র। অর্থাৎ প্রথম আলোয় যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়, শেষ আলোয় সেইখানেই যাত্রা শেষ হতে চায়। সেইটেই হলো প্রাণের টানের জায়গা।...

"এবার যখন থেকে শরীর অপটু হয়ে পড়লো, তখন থেকেই আমার কারখানাঘরের দরজা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বেরিয়ে এসেই দেখি যেখানে ভীড় নেই সেখানে আমার বালককাল। সেখানে যে বিশ্বপ্রকৃতি ভোর বেলায় আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লালন করেছিল, সেই প্রকৃতিই সন্ধ্যা যুথীর মাল্য আমার জন্য গেঁথে রাখছে।...আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আমার মন আবার পলাতক।...

"তার মানে বালকটা লোকান্তরগত হয়নি। ৬৫ বছরের গেটের কাছে যেখানে সানাইয়ে পূরবী বাজছে, সেখানে সেই অকিঞ্চনটা ধূলোয় বসে আছে—সে ভোলা তেমনি ভুলেই রইলো তার বুদ্ধি পাকলো না...তোরা থাকলে এবারকার জন্মোৎসবের রস পূর্ণ হতো।"

শুধু এই নয়, ইন্দিরা দেবী বই পাঠিয়েছিলেন উপহার। কবির মন শ্রান্ত—বই পড়ার উৎসাহও কিছুদিনের জন্য স্তিমিত। পারান্তরে যাবার কথাটাই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই ঐ চিঠিতেই বলছেন, "এবারকার জন্মদিনে বই আমার ঠিক উপহার নয়। এবার ঘাটে ফেরা নৌকার পক্ষে তীরের থেকে শুধু উলুধ্বনিই যথেষ্ট হতো।"

১৩৩৩ সালে শান্তিনিকেতনে বেশ আয়োজন করেই কবির জন্মদিন হলো। উদ্যোক্তাদের তাগিদে কবি 'নটীর পূজা' নাটক লিখলেন। এই উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা বচ্ছে,—শঙ্খধ্বনি ও নহবতের সুরে আম্রকুঞ্জ প্লাবিত, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কবিকে নির্দিষ্ট স্থানে বসালেন, সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ ও কবির রচিত গান গাওয়া হলো। ইটালীর কন্সাল "ইটালীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, তাহা বলিলেন, নিজের হৃদয়ের ভাবও প্রকাশ করিলেন; ইটালীর লোকেরা কিরূপ আগ্রহের সহিত তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা বলিলেন। তাহার পর তাঁহার পত্নী ইটালীয় প্রথায় নতজানু হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদনপূর্বক একটি সুন্দর পুষ্পপাত্রে পুষ্পোপহার দিলেন।" তারপর বল্লেন ফ্রান্সের বাণিজ্যদূত; ইটালীর অধ্যাপক তুচ্চি এবং বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক শ্রী লিম ওো চিয়াং কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সদ্যপ্রত্যাগত এণ্ড্রুজ

বলেন যে "কেবল আফ্রিকার ভারতীয়েরা নয়, ডাচবংশোদ্ভূত বোয়ারেরাও কবিকে ভক্তি করে এবং তথাকার আদিম নিবাসী বান্টুরা অতীতের অজ্ঞানান্ধকার হইতে নিষ্ক্রমণ করিবার পথে ভারতবর্ষের কবির বাণী হইতে আলোক পাইতেছে।" পোর বন্দরের মহারাজা কবির জন্মদিন উপলক্ষে পাঁচ হাজার টাকা উপহার পাঠালেন। মাদ্রাজ প্রবাসী আইরিশ কবি জেমস কাজিনস আয়ার্ল্যাণ্ডকেও কবির দেশ বলে দাবি করলেন। রাত্রে নটীর পূজা অভিনয় হলো।

এই বছরে কবি যে ভাষণ দিলেন সেও জন্মদিনে নামে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। কবি বল্লেন যে এক একটি জন্মদিন আসে, আর পুরানো অভ্যাসের জীর্ণ সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা প্রবল হয়। তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলছেন, "এই শ্যামলা ধরণী, এই নদী, প্রান্তর, অরণ্যের মধ্যে আমার বিধাতা আমাকে অন্তরঙ্গতার অধিকার দিয়েছেন, এর মধ্যে নগ্ন শিশু হয়ে এসেছিলুম। আজও যখন দৈববীণা অনাহত সুরে আকাশে বাজে তখন সেদিনকার সেই শিশু জেগে ওঠে, বলতে চায় কিছু, সব কথা বলে উঠতে পারে না। আজ আমার জন্মদিন সেই কবির জন্মদিন, প্রবীণের না।" আর একটি কবিতাও এবার লিখলেন—'বাঁশি যখন থামবে ঘরে নিভবে দীপের শিখা'—এ কবিতা ঠিক জন্মদিনের কবিতা নয়। যে কোন কারণেই হোক কবির মন উত্তেজিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে সভাসমিতিতে কি কাণ্ড চলবে সেটা আশংকা করেই তিনি বলছেন—

বাঁশি যখন থামবে ঘরে
নিভবে দীপের শিখা
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা
সেদ্দিন যেন কবির তরে
ভীড় না জমে সভার ঘরে,
হয়না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;

সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো। (পরিশেষ ঃ দিনাবসান)

সভাপতিদের প্রতি কবির এই সুনিশ্চিত উপদেশ নিছক রসালাপের উদ্দেশ্যেই নয়। তাঁর পিতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর স্মৃতিরক্ষার বাড়াবাড়ি যে মানুষকে সং সাজিয়ে তুলে অপমান করে,—এই ধরনের একটা মনোভাব নিয়ে মহর্ষি একদিন কবিকে যে কথা বলেছিলেন তা কবির কথাতেই শোনা যাক ; "সদর স্ট্রীটের বাড়িতে বাবামশায়ের তখন খুব অসুখ। কেউ ভাবেনি যে তিনি সেবারে সেরে উঠবেন। এই সময়ে আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে যেতেই বল্লেন,—আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোন ছবি বা মূর্তি ঐ রকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্যথা না হয়।" (কবি-কথা, বিশ্বভারতী, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০)। নিজেকে অমর করে তোলবার দুরূহ বাসনায় সমসাময়িক কালের উন্মত্ত করতালি আমাদের কিছুক্ষণের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু মহর্ষির নিরাসক্ত মন যেমন তাতে বিচলিত হতো না, তেমনি কবির মনেও তার জন্যে বিশেষ উল্লাসের ঢেউ দেখা যায় নি। একটি চিঠিতে বলছেন, "স্মরণসভায় যাঁরা বিলাপ করতেন সাহিত্যসভায় তাঁরা কটূক্তি করবেন" (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩)। বেদনাই রোমান্টিক মনোভাবের শেষ কথা নয়, চিরপরিচিত প্রকৃতির কাছে সান্ত্বনা লাভের আশ্বাসও পেয়েছেন। যে ঝাউয়ের বনে গান বেজেছে এতদিন, সেখানে কি পরেও আর গান জাগবে না। তাই জনতার যে সমাবেশের প্রতি কবির একটুও বিশ্বাস নেই সেখানে তাঁর স্মৃতি টানাটানির কল্পিত ব্যঙ্গচিত্র তাঁকে বিমুখ করেছে—তাঁর মন শান্তি খুঁজছে অন্যত্র—

আমার স্মৃতি থাকনা ঢাকা আমার গীতি মাঝে
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা মর্মরিয়া বাজে। (দিনাবসান)

১৩৩৪-এ উৎসব বা কবিতা কিছুই চোখে পড়ে নি। ১৩৩৫ সালে কবির জন্মদিনে তুলাদান হলো। উৎসব হলো বিচিত্রাভবনে, কবির ওজনের বই বিতরণ হলো নানা গ্রন্থাগারে। ১৩৩৬-এ কবি চলেছেন জাপানে; জাহাজের কাপ্তেন ও যাত্রীরা মিলে সম্বর্ধনা জানালেন। জাহাজেই লিখলেন একটি ইংরাজী কবিতা—'a weary pilgrim'.

১৩৩৭-এ কবি আর শুধু লেখনীর কবি নেই। নূতন সৃষ্টির বৈচিত্র্য অজস্রধারে তখন তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তিনি তখন চিত্রকর। পারীতে দুই বিদেশিনীর প্রাণপণ চেষ্টায় প্রদর্শনী সার্থক হয়ে উঠেছে। কবির জন্মোৎসব হলো ফ্রান্সে; ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন,—"ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫শে বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েছেন তার কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন, তিনি এখন চিত্রকররূপে প্রকাশমান। ...এইবার আমার চৈতালী বর্ষশেষের ফসল সমুদ্রপারের ঘাটে সংগ্রহ হলো।"

১৩৩৮-এর পঁচিশে বৈশাখ সত্তর বছর পূর্ণ হলো কবির। সংসারে যে পরিচয়ে তিনি নিজেকে পরিচিত করতে চান তার কথাই বললেন। বার বার বলেছেন যে তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, দেশনেতা নন—কবি। এই বছরের উৎসবের ভাষণেও সেই কথাই বল্লেন।—"একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম 'আমি চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' সে কথা সত্য বলেছিলাম।" এই ভাষণের শেষাংশে বলছেন,—"এই ধূলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।" (আত্মপরিচয় ৪নং প্রবন্ধ) এবারে কবিতায় বল্লেন যে সংসারের সংঘাত, কর্মোদ্যম আজ স্তিমিত হোক, আজ যে দিন ফুরিয়ে এল, "আমার রুদ্রের মালা রুদ্রাক্ষের অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে।" তাই শেষ দিনগুলিকে বসুন্ধরা তার শ্যামল

দাক্ষিণ্যভরা বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে দিক—পরিপূর্ণ আনন্দে যেন বলে যেতে পারি—

দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই রেখে যাই মোর ভালবাসা।'
(পরিশেষ : জন্মদিন)

১৩৩৯-এ কবি গেছেন পারস্য ভ্রমণে। নানা বৈচিত্র্যের সুধারসে জন্মদিনের পাত্র ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনো প্রধান হয় নিজের মনের চিন্তা, কখনো প্রধান হয়ে ওঠে নানা দেশের সঙ্গস্মৃতি। জন্মদিনে ইরাণের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখছেন। ভৌগোলিক অপদেবতার পাণ্ডাদের আধিপত্য তিনি মানেন নি কোনদিন। তাই তো এত সহজে নানা দেশ তাঁর কাছে নিজের দেশ হয়ে উঠেছে ; তাই তো বল্লেন,—

ইরান, তোমার সম্মান-মালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরাহু এ মোর শ্লোক,—
ইরাণের জয় হক। (পরিশেষ : পারস্যে জন্মদিন)

১৩৪০-এ কবি আছেন দার্জিলিঙে। আত্মশুদ্ধির জন্য মহাত্মা গান্ধী তখন অনশন করেছেন তাতেই মন একান্ত ভারাক্রান্ত। জন্মদিনের লেখা চোখে পড়ে না। ১৩৪১-এ সিংহল চলেছেন, জন্মদিন কাটলো জাহাজে।

১৩৪২-এ কবির চুয়াত্তর বছর পূর্ণ হল। কাব্যস্রোত আবার চললো জন্মদিন উপলক্ষ করে। নানা তত্ত্ব, নানা অনুভূতির ভাবগভীর প্রকাশ কবিতাগুলিকে মহিমান্বিত করে তুললো। এই বছর কবিতা লিখেছেন—'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে', শেষ সপ্তক, ৪৩—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে ধারা চলেছে তারই মধ্যে আমাদের জীবনের একটি একটি করে ছোট ছোট পালা সাঙ্গ হচ্ছে।

ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।

জীবনের এক এক সময়ে এক এক রূপে আমরা কালের প্রসাদ পাই। তারপর সেইরূপ একদিন যায় মিলিয়ে। তখন আমাদেরই মধ্য থেকে একই নামের খোলস ভেঙ্গে আর একজনের জন্ম হয়। সে আমিই কিন্তু নতুন আমি।

একই তার নাম
কিন্তু সে বুঝি আর একজন।

যখন বালক ছিলেন তখন জীবনের একটা বিশেষ অবস্থা গেছে। তাকে আজ আর সত্য করে জানবার উপায় নেই। সে নেই নিজের স্বরূপে, নেই কারো স্মৃতিতে। সেটা ছিল রূপকথার জগৎ।

সে কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ
কিছুকাল ছিল আলোতে
কাল সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।

তার পর আর এক কালান্তরে পঁচিশে বৈশাখ দেখা দেয়। তখন তরুণ যৌবনের বাউল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন বিশ্বের সৌন্দর্য নানা আভাসে ইঙ্গিতে কবির জীবনকে স্পর্শ করেছে। সেই কৈশোরের স্বপ্ন মাখানো জন্মদিনগুলি অজানিতেই কবির উপর ছায়া ফেলে গেছে—

তারা রেখে গেছে
আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙ্গা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা;
ভোরের স্বপ্ন
তারই গন্ধে ছিল বিহ্বল।

কৈশোরের দিন গেল, বাসন্তী রঙের পঁচিশে বৈশাখের রঙ করা প্রাচীরগুলো পড়লো ভেঙ্গে—কঠিন জীবনের পথে কবি এসে দাঁড়ালেন

সেই তৃণ বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে বাঁধানো রাজপথে।

একতারার সুর তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রের তীরে বিচিত্র হয়ে বাজলো, কখনো এসেছে অবসাদ, তারপরেই এসেছে অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা—যে সেবাকে সুন্দর করে, ভয়কে অপমানিত করে, জাগিয়ে তোলে দুঃসাহস। তারাই তাঁর জীবনকে সুন্দর করেছে, নানা গানে, নানা বাণীতে তাদের স্পর্শ রেখে গেছে। তারই মধ্যে আবার কোথায় বাজলো ভেরী, গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে সংগ্রামের সংঘাত উঠলো জেগে। নানা দিক থেকে তখন আঘাত এসেছে—যখন বিদ্বেষ অনুরাগ, ঈর্ষামৈত্রীতে জীবন আলোড়িত—তখন

এই দুর্গমে, এই বিরোধ সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।

এবারের পঁচিশে বৈশাখে 'শ্যামলী' নামে মাটির ঘরটি কবির আশীর্বাদ পেয়েছে। ঘরটি গড়েছেন সুরেন করের পরিকল্পনা অনুযায়ী। খড়ের চাল উঠিয়ে এবার হচ্ছে মাটির ছাদ। পাড়াগাঁয়ের লোকদের সুবিধা হবে একথা ভেবে লিখছেন—"গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সবচেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দিক দিয়ে ওদের সুবিধে।"

১৩৪৩-এ শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব পালন হলো ১লা বৈশাখ। এ বছরে নববর্ষের দিনেই জন্মদিনের ভাষণ দিলেন; বেশ কয়েকটি কবিতা লিখলেন এ বছরের বৈশাখে যার প্রত্যেকটিকেই জন্মদিনের কবিতা বলা চলে। নিজের জীবন ও জন্মকে কেন্দ্র করেই এ কবিতাগুলির ভাবনার আবর্তন।

'বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে' কবিতাটি পত্রপুটের ১২নং কবিতা। জীবনে কি পাওয়া গেছে আর কি পাওয়া যায়নি তারই হিসাব নিকাশ।

-নিজের গভীরতম কামনায় জীবনকে যেমন করে পেতে চেয়েছিলেন তার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের আসর পড়ে আছে পিছনে, আর সময় নেই, ঘণ্টা গিয়েছে বেজে, বেচাকেনার প্রহর ফুরিয়েছে। কবির এই বোধ স্পষ্ট হয়েছে যে জীবনের পথে আত্মানুসন্ধানের জন্যই মানুষের যাত্রা। সেই সন্ধানে কবির জীবনে চাওয়া পাওয়ার বিচিত্র মালা গাঁথা হচ্ছে। আসন্ন বিদায়ের বেদনা নিয়ে কবি মানুষের চিরন্তন মহত্বের উদ্দেশ্যে প্রণাম রেখে যাচ্ছেন—

শুধু রেখে গেলেন নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশ্যে,
মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি,
মৃত্যুর মূল্যে দুঃখের দীপ্তিতে।

বুদ্ধি আর মননের স্পর্শ সকল গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যেও অনুভব করা যাচ্ছে

পত্রপুটের ১৩নং কবিতা—'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট'—এ কবিতাটিকেও কবির জন্মদিনের কবিতা বললে অন্যায় হবে না। হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট জীবনের কোষে কোষে প্রাণরস সঞ্চয় করছে, পৃথিবীর নানা আবেদন সেই হৃদয়ের ছড়ানো পাতাগুলির মধ্য দিয়ে জীবনের বোধ ও অনুভূতিকে প্রবল করেছে—

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে পড়া
রসোলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।

তারপরেই তো আসল চিন্তা। এই যে সংসারের সঙ্গে নানা যোগ স্থাপনের দ্বারা কবির জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো তাকে এখন কার কাছে সমর্পণ করবেন। এই সুদীর্ঘ জীবনের তিল তিল সঞ্চয় যে প্রচুর পরিমাণ হয়ে উঠেছে কার হাতে দেওয়া যাবে তাকে—যে পত্রপুঞ্জে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করেছে তারা তো আজ ঝরবার মুখে—'আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের ঝরবার দিন এলো জানি।' এ কবিতা রচনা হয়েছে ১০ই বৈশাখে। ১৮ই বৈশাখ লিখলেন ১৫নং কবিতা 'ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত' এখানেও জীবনের দুটি গভীর প্রবর্তনার কথা কবি জানালেন। প্রথম জন্মদিন তাঁর কাছে এনেছিল

আলোর রহস্য আর সমস্ত জীবনের জাল বোনার পরে যে নূতন রহস্যের উদ্‌ঘাটন হলো তা হলো ভালবাসার রহস্য। তাই তো জীবনে শাস্ত্রবাঁধা দেবতাকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারলেন না। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার থেকে তাঁর পূজা চলে গেল দিগন্ত পেরিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় পুষ্পখচিত বনস্থলীতে—

বালক ছিলেন যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্র
পেয়েছি আপন পুলক কম্পিত অন্তরে—
আলোর মন্ত্র।

আর শেষ কথা হলো জীবনের মধ্যে এই আলো আর ভালবাসার দ্বৈতপ্রকাশ—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।

১৩৪৪-এ কবি গেছেন আলমোড়ায়। এবার ২২শে বৈশাখ জন্মদিনের তিনদিন আগেই 'জন্মদিন' (সেঁজুতি) কবিতা লিখছেন। গতবছরের দার্শনিকতার ছোঁওয়া লাগানো কবিতাগুলির পর এবছরের জন্মদিনের কবিতা নিতান্তই সরল। এবার আবার মনে হলো কীর্তি খ্যাতির অন্তরালে জীবনের যে সহজ লীলাচঞ্চল ধারাটি চলেছে তাকে কেবলি ঢেকে ফেলি আমরা। জন্মদিনের তিথি মুখর হয়ে উঠে লোকটাকে ভুলিয়ে দেয়, তার নকল রূপ তৈরি করে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয় তাকে। খ্যাতি সম্মানের বাধা তুলে লোকটিকে কেবলি দূরে সরায়—

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ওই লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি তারাই ভুলে থাকে
দোহাই ওগো তাদের দলে লও এ মানুষটাকে।

এ পৃথিবী যে তাঁর ভাল লেগেছে এ কথা বলা যেন তার কিছুতেই শেষ হয় না। ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছে এই মুগ্ধ বিস্ময়বোধের বহু উল্লেখ আছে।

তার প্রধান সুর দুর্জ্ঞেয় রহস্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে নয়, এই ভাললাগায়। তাই এই কবিতার শেষে বলছেন—

সেই যে ভালোলাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে
এই মাটিতে রইলো তাহার বিস্মিত প্রণাম।

শেষ জীবনের বহু কবিতায় এই সুরের সাড়া শুনেছি।

যুদ্ধের কালোছায়া যে ক্রমেই জীবনের উপর গাঢ়তর হয়ে পড়ছে একথা এই সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সকলের কাছেই। যারা যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হচ্ছিল তারা তাদের মনোভাব খুব গোপন রাখতে চেষ্টা করেনি। চীনের উপর জাপানের বর্বরতা, আফ্রিকায় শ্বেতসভ্যতার ব্যভিচার, ইংরাজ রাজশক্তির অসদাচরণ তাঁকে প্রতিদিন বিক্ষুব্ধ করেছে। তাঁর জীবনের শেষ কয়বছরের কবিতায় তার প্রবল প্রকাশ দেখেছি আমরা। মানবতার চিরন্তন আদর্শের পক্ষে সেদিন বিশ্বের পশুশক্তির উন্মত্ত অহংকারের সামনে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। বহুদিন ধরেই নানা প্রবন্ধে তিনি একথা বলে আসছিলেন যে বস্তুর জড়পিণ্ড নিয়ে ইউরোপে যে রেষারেষি চলেছে এ শুধু উপনিবেশের প্রাণ শোষণ করেই তৃপ্ত হবে না, এর তৃষ্ণার্ত জিহ্বা একদিন নিজের ঘরের প্রাণটুকু লেহন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কবির ৭৮ বছরের জন্মদিনে কবি এই দুর্যোগ দেখে লিখেছিলেন,—"আমাদের জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে একী মহামারী বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হলো। -একদিকে কি অমানুষিক স্পর্ধা আর একদিকে কি অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোন বড় আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।···মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মোৎসবে।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি)। ১৩৪৫-এর পঁচিশে বৈশাখ কালিম্পং থেকে বেতারে পড়ে শোনালেন তাঁর জন্মদিনের কবিতা। বিশ্বমানবের হয়ে কবি ধিক্কার দিলেন তাদের যারা

এই চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে এনেছে। এই যুদ্ধ সজ্জার পরিণতি কত স্পষ্ট হয়েছিল তাঁর কাছে তারই চিহ্ন এই কবিতা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কল্পনাবিলাসী, বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ নেই এই অভিযোগ মেকী বাস্তববাদীরা সুদীর্ঘকাল করেছেন। কিন্তু কবির জীবনের শেষ কয় বছরের আলোচনা এই কথাই প্রমাণ করবে যে কোন স্থবির চিন্তা বা কল্পনার ধূম্রজালে নিজেকে গোপন রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনিই পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মিক শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন আবার তিনিই পাশ্চাত্যের যুদ্ধোদ্যমকে মানুষ-জন্তুর হুংকার বলেছেন। ১৯৪০ সালে আবার তিনি কালিম্পঙ্ যান। তখন তিনি যে পত্র লেখেন অমিয় চক্রবর্তীকে তাতে বলছেন, "লুব্ধ অভ্যাস-বশতঃ না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হননীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্য কারো বা কষের দিকে গোপনে দাঁতগুলি কি অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলেছিল আজকের দিনে বড়ো করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণভাবে সেটা প্রকাশ পেল।" ১৩৪৫ সালের জন্মদিনে এই ভাবনাই কবিতায় রূপ পেলো। আসন্নবিদায়ের পটভূমিকায় এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ শুধু তাঁরই মর্মবেদনাকে প্রকাশ করলো না, পাঠকচিত্তকেও ভাবতরঙ্গিত করে তুললো। কবির বুদ্ধি আর অনুভূতির নিবিড় মিলনে কাব্য সুন্দর হলো—পৃথিবী ছেড়ে যাবার বেদনা যেমন প্রবল তেমনি কঠিন মানসিক বলিষ্ঠতা অন্যায়কে ধিক্কার দেবার—ইংরেজি কবি দুঃখ করেছেন—Thus the world ends, not with a bang but with a whimper. রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায়ের পরিণতি এই হতাশ্বাস ব্যর্থতার ছবি নয়—জীবনও তাঁর কাছে কোনদিনই নিরর্থক ঘটনার সমষ্টি নয়—তাই জীবনের ব্যাভিচারকে ক্ষমা করার দুর্বলতাও তাঁর ছিল না কোন দিন।

'জন্মদিন' কবিতার অধিকাংশই নিজের কথা। মৃত্যু কাছে এসেছে, আজ যেন জীবন মৃত্যুকে পাশাপাশি দেখে সমস্ত জীবনের একটানা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে—

আজ মম জন্মদিন···

···আসিয়াছে কাছে

জন্মদিন মৃত্যুদিন ; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে ;
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম ;

একদিন যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা বেঁধে রেখেছিল বিশ্বের সঙ্গে সহস্র সম্বন্ধের বন্ধনে যাবার সময় সেই বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। কবি বুঝতে পারছেন দৃষ্টির স্বচ্ছতা কমে আসছে, নিষ্প্রভ নেপথ্যের আহ্বান বর্তমানের অস্তিত্বকে ঢেকে ফেলছে। কিন্তু সব প্রয়োজনের বাঁধন কাটলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মানুষ তাকে সম্মান না জানিয়ে তো পৃথিবীর উপায় নেই। তাই বলছেন,—

তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছে শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে।···
···কিন্তু, জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।

নিজের ভালবাসার উপর এতই বিশ্বাস যে অক্লেশে তিনি বলতে পেরেছেন যে দায় চুকলেও সংসারের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। দিনে দিনে যে জীর্ণতা সঞ্চিত হচ্ছে সেই কি জীবনের চরম সত্য। সকল আলো বিলুপ্ত করে, সকল রূপ গোপন করে যে অমানিশার আবির্ভাব সেকি আর সব কিছুই ছাপিয়ে যাবে। তাই তিনি বললেন 'জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।' যে ভালবাসা তাঁর জীবনের শেষ রহস্য সে কি কলুষিত অভিজ্ঞতার কাছে হার মানবে। জীবন কি শুধু ক্ষয়ক্ষতির সমষ্টিরূপেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে। তাই কবি বলছেন যে 'আমার সে ভালবাসা সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে,' অভ্যাসের জড়তায় আজ সে যতই মলিন হোক মৃত্যুর পরপারে তার অমৃতরূপ জেগে উঠবে। তারপর প্রকাশ পেলো পরম প্রেমের অভিমান—যাবার দিনে যা কিছু নিয়েছি সব দিয়ে যাবো, যে দানে জীবন প্রতিদিন ভরে উঠেছে, নানা পুরস্কারে তার প্রতিমুহূর্ত সার্থক হয়েছে, আজ সবই ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে : তবু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে যেতে দ্বিধা নেই সে সংসারের কাছে অশেষ ঋণ

রইল—রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন কবির এই মনোভাব কত আন্তরিক—

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা কিছু দিয়েছে তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয় ; তাহে সে পাবে না লাজ ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো, অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

এ তো গেল নিজের কথা। তারপর আধুনিক কালের প্রসঙ্গ এলো—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধের রোল উঠেছে—মানুষের হাতে মানুষের অপমানের চূড়ান্ত হতে আর দেরী নেই—সেদিন কবির সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুস। তিনি তাঁর লেখায় জানিয়েছেন কেমন করে অতন্দ্র রাত্রিতে মানবসভ্যতার এই সদাজাগ্রত প্রহরী নিজের বুকের ব্যথার আলোটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন। এবারও তাই হলো কবি শুনতে পেলেন মানুষ জন্তুর হুহুংকার। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হলো প্রতিবাদ—জন্মদিনের কবিতা আর ব্যক্তিগত ভাবমন্থনেই সীমায়িত রইলো না—

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে ওঠে বাজি।

১৩৪৬-এর পঁচিশে বৈশাখ কবি আছেন পুরীতে। সেখানে কবির জন্মোৎসব পালিত হলো বিপুল উৎসাহে। উড়িষ্যার মহিলারা কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন। পরদিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় সরকারী সম্বর্ধনা হলো। মন্দিরের পুরোহিতরা কবির আয়ুবৃদ্ধি কামনা করে প্রশস্তি পাঠ করলেন। তখন এণ্ড্রুস সাহেবও সেখানে—তিনিও কবির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে নিজের লেখা কবিতা পড়লেন। কবি দিলেন তাঁর ভাষণ। এ বছরের কবিতা 'জন্মদিন' (নবজাতক) একটি গভীর চিন্তাকে প্রকাশ করছে। বিদায় বেদনার কথা নেই, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসার কথা নেই, যে ভক্তের

দল কবিকে দেবতা করেছে, যারা কবিকে নানারকম দৃষ্টিতে দেখছে তাদেরই কবি বলছেন, তোমাদের এই মনগড়া রবীন্দ্রনাথ কতক্ষণের। আজ যাকে নিয়ে এত ব্যবস্থা, এত আয়োজন, যাকে জেনেছি, চিনেছি বলে এত গর্ব আমাদের, তাঁকে সত্যি সত্যি কতটা জেনেছি। যে রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী বলে আমাদের অহংকার তিনি কি সত্যিই সংসারের কালরাত্রিকে মুছে ফেলতে পারবেন।

কবি বলছেন, তোমরা যাকে সৃষ্টি করছো সে একান্তই তোমাদের খণ্ড ধারণার সৃষ্টি। তোমরা যাকে রবীন্দ্রনাথ বলে জেনেছ সে তো আমি নই:—

তোমরা রচিলে যারে নানা অলংকারে
তারে তো চিনিনে আমি, চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।

সৃষ্টির রহস্য কে জেনেছে কবে। যাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করে আমাদের ভাললাগার ছাপ মেরে দিলুম, স্রষ্টার তৈরি রবীন্দ্রনাথের সে কতটুকু। অনন্ত কাল ধরে কত সৃষ্টিই তো মানুষ দেখছে, কতটুকুই বা বুঝেছে তার। তবু কি অহংকার—পুতুল গড়ে ভাবি সে পুতুল চিরস্থায়ী। স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করেন তখন বিচিত্র রহস্যের যবনিকার গোপনে থাকেন তিনি। বাইরে থেকে গর্বিত মানুষ সেই সৃষ্টিকে বোঝবার আত্মপ্রসাদ লাভ করে—কি তার সম্বল,—

খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।

কবি জানেন যে সৃষ্টি মাত্রেই একদিন 'কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।' অমরত্বের ভান আমাদের আছে, কেবল ভাবছি যা এনেছি তা অমূল্য। তারপর হঠাৎ একদিন কালের বিস্তৃত প্রান্তরে দেখা গেল 'মুঠি কয় ধূলি রয় বাকী।'

সময় বিশেষে এ কথা সত্য যে জনতার উল্লাসময় অভ্যর্থনা কোন সম্ভাব্যতার সীমা মানেনা। তাই আজকের জীবনের চেয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন অনেক সময় বেশি করে মন ভোলায় আমাদের। এ কবিতায় কবি সেই ব্যর্থ আশ্বাসকে মানেন নি। তাঁর বক্তব্য এই যে ভালো লাগার জন্য সংসার যা দিয়েছে এই তো যথেষ্ট—সৃষ্টির সব তত্ত্ব জেনেছি কেন এই অহংকার।

১৩৪৭-এর বৈশাখ এলো মংপুতে। কবি গেছেন সেখানে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করে। পাহাড়ীদের মধ্যে যে উৎসব হলো তার সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন,—"পঁচিশে বৈশাখের দুতিনদিন আগে একটা রবিবারে এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হলো। সকাল বেলায় দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রঙের জোব্বা পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধ মূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করলেন। উনি উপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুরবেলা জন্মদিন বলে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধ বৃদ্ধের কথা ছিল। বিকেল বেলায় দলে দলে সবাই আসতে লাগলো—আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী সানাই বাজাতে লাগলো, গেরুয়া রং-এর জামার উপর মাল্যচন্দন ভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলো। ঠেলা চেয়ারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল।"

সেইদিন তিনটি কবিতা লিখলেন, 'জীবনের আশিবর্ষে প্রবেশিনু যবে', 'কালপ্রাতে মোর জন্মদিনে' আর 'অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে' —পরদিন খবর পেলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে—তখন লিখলেন 'আজি জন্মবাসরের বক্ষভেদ করি।' প্রথম কবিতাটি নিজের কথা, দ্বিতীয়টি বুদ্ধ বন্দনার, তৃতীয়টি পাহাড়িয়াদের শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। প্রথমটিতে কবি বলছেন যে একদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে জন্ম নিলো পৃথিবী, তার উপরে প্রাণের প্রকাশ শাখায়িত হলো রূপে রূপান্তরে 'উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়।' সেই অসম্পূর্ণ প্রাণ প্রকাশ বহকাল বদ্ধ হয়ে থাকলো পশুলোকের মধ্যে। তারও বহকাল পরে 'মন্থর গমনে এলো মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।' তার চেতনার স্পর্শে নূতন নূতন আলো জ্বলে উঠলো, 'নূতন

নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী।' পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে চৈতন্যের প্রকাশ দেখা যেতে লাগলো ধীরে ধীরে। এই পৃথিবীর গতির ভিতরে যে রহস্য, যে প্রবর্তনা তারই রূপ উদ্ঘাটনে কবি আশিবছর চেষ্টা করেছেন—

আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে। (জন্মদিন, ৫)

এই গৌরব প্রত্যেক স্রষ্টার। সাধারণ যারা তারা যা দেখে তার অতিরিক্ত আর কিছুর খোঁজ রাখে না। তাই ছোটখাটো সবকিছুই যে রহস্যের আবরণে ঘেরা এ বোধই বা কজনের আছে। সেই রহস্যের যবনিকা তোলার কাজ যারা পেয়েছেন সেই কাজই তাঁদের পুরস্কার।

জন্মদিনের ৬নং কবিতায় সেই বুদ্ধ ভক্তকে স্মরণ করলেন যিনি তাঁর জন্যে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন। শ্রদ্ধার অকুণ্ঠিত অর্ঘ্যকে কবি গ্রহণ করেছেন, পরিবর্তে দিলেন কবিতায় আশীর্বাদ। শুধু তত্ত্ব বা পূর্বস্মৃতি বা বিচ্ছেদ-বেদনায় যে জন্মদিনের কবিতা এতদিন রূপলাভ করেছিল তার মধ্যে এবার ব্যক্তি এলো। সেই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মনে নূতন ভাবের সুর লাগলো—মন ব্যাকুল হলো বুদ্ধবন্দনায়। আশীবছরের প্রান্তে উত্তুঙ্গ ধ্যাননিমগ্ন পর্বতমালার বুকে বুদ্ধবন্দনা তাঁকে স্মরণ করালো যে তাঁর সাধনার পুণ্যফল আমরাও পেয়েছি। নিজের জীবন শুধু নিজের কৃতিত্বের চারপাশেই আবর্তিত হচ্ছেনা—যা কিছু সুফল অর্জিত হয়েছে এই পৃথিবীতে আমরা তার সব কিছুরই অংশ পাই।

প্রবেশি মানসলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও। (জন্মদিন, ৬)

জন্মদিনের ৭ নং কবিতায় পাহাড়িয়াদের কথা, যাদের নাচ, যাদের অভ্যর্থনা কবির ভাল লেগেছে, তারা সকলেই তাঁকে ফুল উপহার দিয়েছে। সেই ফুল তপস্যাতপ্ত পৃথিবীর বুকে শান্তির চিহ্ন। কবির কাছে এ শুধু একটি দিনের সম্মান নয়। এই ফুল যেন অপেক্ষা করে ছিল কবে সে মানুষের জন্মদিনের উপহার হয়ে সত্য হয়ে উঠবে। বিশ্বের যা কিছু সুন্দর সে যেন মানুষকে প্রণাম জানাচ্ছে। সেই নমস্কার গ্রহণে কবি সেই সম্মানই পেলেন যা নক্ষত্রখচিত মহাকাশের জ্যোতিঃ সম্পদের মধ্যেও কেউ কখনো পায় নি —

ধরণী লভিয়াছিল কোনক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহুযুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার বরে এই বর,
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ। (জন্মদিন, ৭)

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে যে কবিতা লিখলেন তার মধ্যে মৃত্যুর গৌরব ঘোষিত হলো। জীবনের সায়াহ্নবেলায় মৃত্যুর দীপ্তি এসে লাগলো মনে, অস্তোন্মুখ সূর্য যেমন রাত্রির মুখশ্রীকে স্বর্ণময়ী করে দেয় তেমনি জীবন পশ্চিমপ্রান্তে এসেও মৃত্যুর স্পর্শে দীপ্ত হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে জন্মদিনের একটি কবিতায় কবি জীবনমৃত্যুকে একসূত্রে বাঁধা দেখতে চেয়েছেন। আজ মৃত্যুর আঘাতে সেই সুর আবার বাজলো। যে অখণ্ড জীবনের সাধনা তাঁর সারা জীবনের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রণোদিত করেছে তাকেই যেন জন্মমৃত্যুর মিলিত সীমায় কবি দেখতে পেলেন—

আলোক তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে ;
সে মহিমা উদ্বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে। (জন্মদিন, ৮)

এই সময় জন্মদিনের তারিখটিতে ছাড়াও তিনি অন্যদিনে যে সব কবিতা লিখেছিলেন তার অনেকগুলিকেই জন্মদিনের কবিতা বলা যায়। তাঁর মনে শেষ বছরটিতে কেবল একটি কথাই নানাভাবে ঘুরে ঘুরে এসেছে, তা হলো বিদায়ের সময় সকলের সঙ্গে নিজের প্রীতির বন্ধনকে আর একবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যাই। অনেকদিন আগে লিখেছিলেন 'যাবার বেলায় এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই, যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' সেই কথা শেষ দিনগুলিতে বারবার বলেছেন; পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুগুলিকেও কি ভালবাসার চোখেই তিনি দেখেছিলেন। আজ যাত্রার সময় যখন এসে গেল তখন সব তত্ত্ব ভুলে সব দার্শনিকতার ছোঁওয়া এড়িয়ে তিনি প্রাণভরে একটি কথা বললেন—মানুষের ভালবাসা আর আশীর্বাদ নিয়ে গেলুম। ফুলদানি থেকে আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাঁপড়ি ঝরে পড়ে একে একে, কিন্তু সেখানেও তো মৃত্যুর ব্যঙ্গ নেই—বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে কিন্তু ভর্ৎসনা নেই। কবি বলছেন—

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে……
সমুজ্জ্বল গৌরবে প্রণত সুন্দর অবসান। (জন্মদিনে ২৬)

নিজের জীবনকে কত বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত করে কবি দেখেছেন—সেই নব রূপায়ণই তাঁর আনন্দ। নিজের জীবন যেন একটা নদী, নানা গিরিশিখরের দান নিয়ে সে চলেছে, 'পূর্ব-পশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।' সেখানেই কবির আসন পাতা হয়েছে, মিলেছে অঞ্জলিভরা দান—পথে পথে অবারিত আতিথ্য মিলেছে আর এক একটি করে পঁচিশে বৈশাখ পূর্ণ হতে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে—

আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।
(জন্মদিনে ২৮)

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ কবিতাই জন্মদিনের কবিতা। মংপুতে যে জন্মদিন পালন করলেন তারই স্মরণে জন্মদিনের প্রথম কবিতাটি

লিখেছেন। সেদিন 'হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে'"আলোর চন্দনরেখা দেখা দিল; সেই বিরাট পর্বত স্মরণ করিয়ে দিল—'যে মহা দূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মাঝখানে'—তাকেই। সেই দূরত্বের অনুভব প্রবল হয়ে উঠেছে। নিজেকে মনে হচ্ছে 'অলক্ষ্যপথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।'

দ্বিতীয় কবিতায় অসম্পূর্ণ প্রকাশের বেদনা। আশী বছর ধরে কত রূপ কত রঙের লীলায় জীবন উজ্জ্বল হলো কিন্তু নিজেকে তো সম্পূর্ণ করে তবু প্রকাশ করা হলো না। একটি একটি করে জন্মদিন আসে, কিছু কিছু করে প্রকাশ হয়, কিন্তু তবু যা অব্যক্ত যা অজানা তার অংশটাই বেশি—তারই প্লাবনে সত্তা ডুবে আছে।

এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর (জন্মদিনে ২)

আর একটি কবিতায় কবির শারীরিক ক্লান্তির ইঙ্গিত আছে—বসন্ত এসেছে পলাশবনে, গাছের শাখায় শাখায় ফুলের ভার ফুটে উঠেছে। কিন্তু উৎসবে কবি যোগ দিতে পারলেন না। প্রত্যেক জন্মদিনের আগে বসন্তের এই নবোচ্ছ্বাস তাঁর মন পূর্ণ করে দিয়েছে কিন্তু এবারে (১৩৪৭) তা হলো না। এবার যাবার সময় বিরহবেদনায় মনের পাত্র ভরেছে—তারই মধ্যে কবি দেখতে পাচ্ছেন নতুন জন্মদিন আসছে—

জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে। (জন্মদিনে ৪)

১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ কবির 'জন্মদিনে' কাব্য প্রকাশিত হলো। শেষ জীবনের নানা অনুভূতির রঙে রঙীন, গভীর উপলব্ধির রসে পূর্ণ এই কাব্য। প্রতিমা দেবী বলছেন, "তিনি এই শুভ জন্মতিথিতে দেশকে ও মানুষকে শেষ উপহার দিলেন, এই কবিতাগুলি তাঁর জীবনযজ্ঞের আহুতির শিখা, অনেক দুঃখের তপস্যার ফল। এর পাতায় পাতায় রয়েছে তাঁর শেষ বর্ষের ইতিহাস।......বইখানি তাঁর রোগশয্যার মানসিক দর্পণ। তিনি তাঁর জন্মযাত্রার আয়োজন যেন ভরে নিয়েছেন গভীর অনুভূতির চরম দেখায়।

যে জীবনদেবতার ধ্যান প্রথম বয়সে তাঁর মনে নিবিড় হয়েছিল, কালে কালে তাই মহামানবের বিরাট অনুভবে এসে মিলিত হলো।" (নির্বাণ) এই নববর্ষের দিনে তাঁর জন্মদিনের উৎসব হলো—সে বর্ণনাও নির্বাণেই আছে—"তাঁকে সামনে বসিয়ে জন্মদিনের উৎসব যে আর হবে না তখন তা কে জানত, কিন্তু এবারকার আয়োজনটি হয়েছিল সুন্দর, কত বন্ধু তাঁর কত জিনিস পাঠালেন, ফলে ফুলে ঘর ভর্তি হয়ে গেল, বিশেষ করে আমের সাজিতে; এই ফলটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়···সন্ধ্যাবেলায় তাঁর নাতনী তাঁকে জন্মদিনের সাজে সাজিয়ে দিল শুভ্র গরদের ধুতি উত্তরীয় মাল্যচন্দনে। ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হলো উত্তরায়ণের বারান্দায় যেখানে জন্মতিথির অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রস্তুত ছিল। তিনি রুগী, কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্যোতি সমস্ত রোগক্লিষ্টতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মনে হোলো কোন ধ্যানলোকের দেবতা এসেছেন আজ নববর্ষের বিশেষ পূজা নিতে।"

এবারের জন্মোৎসবে আর একটি বিশেষ ঘটনা 'সভ্যতার সংকট'। সর্বকালের সর্বমানবের কবি যাবার আগে ডাক শুনিয়ে গেলেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে একটি কবিতা লিখলেন। সে কবিতায় তত্ত্ব নেই, দার্শনিক চিন্তা নেই, একটি অতি সহজ বাসনা প্রকাশ পেয়েছে—আশ্রমবাসীদের কাছে বলেছিলেন নববর্ষের ভাষণে, 'সকলের এই স্নেহমমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি, প্রণাম করে যাই তাঁকে, যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।' রানী চন্দের সঙ্গে কথাবার্তায় এই কথাটাই বার বার বলেছেন, এবারের কবিতায় বল্লেন শেষ কামনা প্রকাশ করে—

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

এমনি করে একটি একটি জন্মদিন এসেছে আর কবি নিজেকে নানা ভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন; এই কবিতাগুলি কখনো নিপুণ আত্ম-বিশ্লেষণ, কখনো গভীর তত্ত্বচিন্তা আবার কখনো সহজ কামনাবাসনার বাহন হয়েছে। যত শেষের দিকে চলেছে জীবন সুর ততই ব্যক্তিগত এবং তত্ত্বস্পর্শহীন হয়েছে। স্নেহভালবাসাকাতর ব্যক্তিটি কবির অন্য সব ভাবনাকে ছাপিয়ে নিজের কথা বলে নিয়েছে।

যে পক্ষের পরাজয়

যেদেশে বাস করি সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই কি আমাদের দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তার বাইরে যে বিরাট পৃথিবী পড়ে আছে, যেখানে ইতিহাসের উত্থান পতনে কত জাত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, কত জাত ইতিহাসের পাতা থেকে অবজ্ঞা আর অনাদরের লাঞ্ছনা মাথায় করে সরে যাচ্ছে সেখানেও আমাদের উৎসুক জিজ্ঞাসা ছুটছে। ন্যায় অন্যায়ের যে মানদণ্ড নিয়ে ঘরে বসে বসে ছোটখাটো ঘটনা মাপি, মাঝে মাঝে বাইরে বেরুতে হয় সেটা নিয়ে। মাৎস্যন্যায় শুধু বাংলাদেশে গোপালের রাজ্যকালের পূর্বেই ছিল না, সে আছে সারা পৃথিবীতে। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি—এ কাহিনী শুধু দুই বিঘার মধ্যেই বদ্ধ নেই, সারা জগতে ঐ একই অন্যায় নীতির রথ চলছে। ঘরে যে বদ্ধ হয়েছে সে অম্লানবদনে ভাবে বাইরের জগতে কি হলো না হলো তা নিয়ে কেন বনের মোষ তাড়াই। কিন্তু বাইরে যে বেরোয়, জগতের কোন দেশকে অনাত্মীয় মনে করার মত মন যার ছোট নয়, সে তো চুপ করে থাকে না। তাকে সাড়া দিতে হয় নইলে তার চৈতন্যের গভীর লোকে বিবেকের দংশন তাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্পেনে নূতন নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো রাজশক্তি সীমায়িত, গণতন্ত্রের সূচনা হলো তারই মধ্যে। দূর ভারতবর্ষে অশিক্ষার কালো আকাশে আচ্ছন্ন দেশে একটি আলোর শিখা তখন সবে জ্বলেছে—রামমোহন রায়। স্পেনে নিয়মতন্ত্রের জয়কে তাঁর নিজের জয় বলে মনে হলো। বন্ধুদের আহ্বান করলেন, আয়োজন করলেন ভোজসভার। বললেন—এসো আনন্দ করি, মানুষের

ন্যায়বোধের জয় হয়েছে ওখানে। স্বাধীনতার লড়াই লড়তে লড়তে নেপলসের মানুষ পরাজিত হচ্ছে এখবর তাঁর মনকে বিষণ্ণ করেছে। তিনি লিখছেন—"From the late unhappy news I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies.......Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful." (বকল্যাণ্ডকে লেখা চিঠি) কে জানে কোথা থেকে এই চেতনা তিনি পেয়েছিলেন; প্রতিভার আচরণ আমাদের বোঝবার ক্ষমতার সীমার মধ্য দিয়ে চলে না সব সময়ে।

ঐ ধারাতেই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর কর্ণ বলছে কুন্তীকে, 'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।' কী আশ্চর্য এই কর্ণের চরিত্র। মহাভারতের কবি কর্ণকে প্রবল শক্তিশালী বীর্যবান মহান চরিত্র করে এঁকেছেন। সেই বীরত্বের আর একটি ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। এ বীরত্ব বাহুবলের নয়, বিজয়ী পক্ষের নেতৃত্বলাভের আহ্বান প্রত্যাখ্যানের।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার মধ্যে শুনেছি ঐ সুর, বিশ্বকবির বীণা রুদ্রস্বরে বেজেছে পরাজিতের গৌরব ঘোষণায়। কিপলিঙের যুদ্ধবাদ নয়, নোগুচির জাতীয়তা নয়; অন্তরের গভীরে মনুষ্যত্বের মর্যাদার যে গভীর আবেদন আছে, সুর বেজেছে সেখানে। তিনি পরাজিতের কবি,—জার্মানির হাতে বিধ্বস্ত বেলজিয়ামের, সোভিয়েট বিমানে আক্রান্ত ফিনল্যাণ্ডের, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতায় অকালচূর্ণ চেকোশ্লোভাকিয়ার, জাপানের হাতে ক্ষতবিক্ষত চীনের, ইউরোপের হাতে মার খাওয়া আফ্রিকার কবি তিনি। কর্ণ বলেছিলেন 'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই নিজেকে নিষ্ফলের হতাশের দলের লোক বলে জানতেন না। তিনি জানতেন ইতিহাসের অনিবার্য গতিতে

> রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
> জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

শক্তিশালীর প্রভাবকে কখনই রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেন নি। তিনি পরাজিতের নিষ্ফলতাকে ইতিহাসের শেষ কথা বলেন নি। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালো ছায়া পৃথিবীতে দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে তখন সেই আসন্ন বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি। লোভ যে সম্পদ আহরণ করে আনে তাকে মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত ঐশ্বর্য জ্ঞান করে এসেছে এবং অহংকৃত হয়েছে সঞ্চয়ের মরীচিকায়। লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জন্যে জগৎজুড়ে অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন চললো। সেই ঐশ্বর্য আজ ভেঙেচুরে তার ভগ্নাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে।'

অত্যাচারিত পরাজিত জাতি কবির কাব্যের বিষয়বস্তু হলো প্রথম বোধ হয় বলাকায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ডঙ্কা যখন বেজে উঠলো তখন বেলজিয়ম নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলো। নিরপেক্ষ দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য পাঠানো চলে না। জার্মানির লক্ষ্য ফ্রান্স, সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়মের বন্দরগুলিও বটে। বেলজিয়াম জার্মানিকে সৈন্য পাঠাতে দেবেনা তার দেশের উপর দিয়ে। তাই সে রইলো নিরপেক্ষ কিন্তু জার্মানি তখন মনস্থির করেছে যুদ্ধ করবেই। একদিন সে আক্রমণ করে বসলো বেলজিয়াম। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন বেলজিয়ামের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। নিতান্ত ক্ষুদ্র দেশ, সৈন্যসংখ্যা তিন লক্ষ, জার্মানির সৈন্যসংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ। কিন্তু দেশের সম্মান রক্ষার জন্য ঐ তিন লক্ষ সৈন্য প্রাণপণ শক্তিতে লড়াই সুরু করলো। ইউরোপের ইতিহাসে বলা হচ্ছে—"The army of Belgium, under the command of King Albert, lined the Yser and partly protected by inundation, withheld until the end of the war a narrow strip of Belgian territory from the invaders. The

Belgian army, albeit small and severely depleted by casualties, rendered an essential service. (Fischer) বেলজিয়ামের এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে ইংলণ্ড বিচলিত হলো। লর্ড এসকুইথের মন্ত্রিসভা বেলজিয়ামের উপর জার্মান আক্রমণের প্রসঙ্গ আলোচনা করে ইংলণ্ডকে যুদ্ধে নামাবার ব্যবস্থা করলেন।

"The unprovoked violation of an innocent country whose neutrality Prussia had solemnly guranteed settled the mind of the Asquith cabinet, dispersed the doubts of the Labour Party in parliament and satisfied the people that the war was justly undertaken" (Fischer)

অন্যান্য দেশেও বেলজিয়ামের সাহসী প্রতিরোধের জয়গান শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথও চুপ করে থাকতে পারলেন না। একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন—"বেলজিয়ামের কীর্তি মনে খুব লেগেছে—সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেও ছিলুম—হয়তো দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে।" (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪)

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এই সময় রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি ছিলেন। রামগড় পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ গেছেন তখন গরমের ছুটিতে। আসন্ন যুদ্ধের কালো ছায়া কবির মনের দিগন্তেও অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। এণ্ড্রুজ লিখছেন :—

At the beginning of the European War this strain had become almost unbearable owing both to the world tragedy of the war itself and the suffering of Belgium which the poet felt most acutely. He wrote and published simultaneously in India and England three poems which expressed the inner conflict going on in his own mind. The first of these were called the Boatman and he told me, when he had written it, that the women in the silent courtyard 'who sits in the dust and waits' represented Belgium. The most famous of the three poems was the Trumpet. The third poem was named the Oarsman. Its outlook is beyond the war; for it reveals the daring venture of faith that would be needed by humanity if the old world with its dead wings were to be left behind

and the vast unchartered and tempestuous seas were to be swayed leading to a world that was new." (Letters to a friend)

Boatman কবিতাটি বাংলা বলাকার পাঁচ নম্বর কবিতা। কলকাতায় লিখেছিলেন ৫ই ভাদ্র ১৩২১। এই কবিতাটির প্রতীক্ষারতা নারী কে সে? কবি বলছেন—

"I know not at what shore, at last, he lands to reach the silent courtyard where the lamp is burning and to find her who sits in the dust and waits."

এণ্ড্রুজ লিখছেন নীরব প্রাঙ্গণে ধূলায় বসে প্রতীক্ষা করছে যে নারী সেই বেলজিয়াম। ঝড়ের রাতে বেলজিয়ামের দুর্যোগের দিনে তার নেয়ে আসছে তার কাছে। আকাশের অবস্থা—

কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে;

সেই যে নেয়ে আমারই জন্য আসছে, কি আনবে সে? ইতিহাসের দেবতা বেলজিয়ামের দুঃখের দিনে কি আনবেন—

নহে নহে নাইকো মাণিক, নাই রতনের ভার
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার।

বৈষয়িক লাভ তো হবেই না, মরবে লক্ষ লক্ষ লোক জলে পুড়ে, ছাই হবে নানা গ্রাম, জয়ধ্বনি তো উঠবে না তবে কেন এই সংগ্রাম। এর উত্তরে সেই প্রতীক্ষারতা কি বলবে—

বাজবে নাকো তূরীভেরী জানবে নাকো কেহ
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ
দৈন্য যে তার ধন্য হবে পুণ্য হবে দেহ।

'পাপের মার্জনা' নামে একটি ভাষণ দিলেন ৯ই ভাদ্র। সকলের দুঃখকে নিজের করে নিলেন। যা বললেন তার মূল কথা এই যে পাপের বোঝা জমিয়ে তোলার পাপ তো আমাদের সকলের। একজন আহত হয়েছে কিন্তু সে আঘাত আমাদের সকলেরই লেগেছে। "মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে

দূরে দুরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে।” এই পাপের মার্জনা ভাষণটির সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে বলাকার ৩৭নং কবিতার, এখানেও কবি যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর সঞ্চিত পাপের কথায় বলছেন—

এ আমার এ তোমার পাপ…
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান।

বলিষ্ঠ আশা এই কবিতার শেষ কথা। পাপ মরবে, অহংকার নিজের ভারেই নুয়ে পড়বে। তারই জন্যে দলে দলে লোক ছুটছে, তারই জন্যে প্রবল মৃত্যুর সামনেও মানুষ অকম্পিত বুকে দাঁড়াচ্ছে।

মনে রাখতে হবে এই কবিতাগুলির ইংরাজী অনুবাদ করে তিনি পাঠিয়েছিলেন বিদেশে। বেলজিয়ামের পক্ষে তাঁর সহানুভূতি প্রমাণ করছে আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জাগ্রত সচেতন চিত্ত শুধু তত্ত্বকথা বলেই শান্ত হয়নি।

১৯৩৮ সাল, জাপান আক্রমণ করেছে চীনকে। প্রতিদিন নিত্যনতুন নিষ্ঠুরতার কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে সংবাদপত্রে; গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে যাচ্ছে, নীল আকাশ থেকে জাপানী বিমান অনর্গল জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ফেলছে, হাহাকার আর ক্রন্দনে তার প্রতিধ্বনি সেই আকাশেই ছড়িয়ে যাচ্ছে।

১৯১৬ সালে কবি গিয়েছিলেন জাপানে। কি অকুণ্ঠ প্রশংসা সেদিন করেছিলেন। জাপানী শিল্পীদের মারফৎ বহুপূর্ব থেকেই জাপানী সৌন্দর্য-সাধনার পরিচয় তিনি পেয়ে আসছিলেন। বৌদ্ধধর্মের শান্তির সাধনা ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের সাধনাকে এখানে একটি নম্র মূর্তিতে তিনি মিলিত হতে দেখেছিলেন। তিনি নিঃসংশয়চিত্তে ঘোষণা করেছিলেন—“এমনতরো সর্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।”

জাপানী এক ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলেন—"বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই।" এই কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ না পেয়ে তিনি লিখেছিলেন, "জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়,—আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেইজন্য এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে আঘাত করে না।"

দুদিন থাকবার পরই দেখলেন জাপানের যুদ্ধস্পৃহা তখনই প্রবল হয়ে উঠছে, রাজ্য বিস্তারের যে খেলা পাশ্চাত্য রাজনীতির মূলে সেই খেলাতেই জাপান মেতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই পররাজ্যলোভী জাপানী বিস্তারবাদের তীব্র প্রতিবাদ করলেন দুটি প্রবন্ধে। একটি The Spirit of Japan আর একটি The Nation; এই প্রবন্ধ দুটি শুধু তৎকালীন জাপানী শাসকদের লোভ ও যুদ্ধোন্মত্ততাকেই আঘাত করলো না, এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের শেষ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে মানুষের ইতিহাসে তার বিষময় ফলের কথা তুলে ধরলেন। জাপান কবির কথাকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেনি। সেখানকার সংবাদপত্রে প্রচারিত হলো যে কবি 'পরাজিত জাতির গুরু'। কবি বুঝলেন যে ঐ বিশেষণের দ্বারা জাপানের মানুষের মন থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। উন্মত্ত যুদ্ধবাদীদের এই হীন আঘাতে ব্যথিত কবি একটি কবিতায় পরাজিতের গান লিখলেন।

My master has bid me
While I stand at the roadside,
To sing the Song of Defeat,
For that is the bride whome He woos in Secret.
(Song of the Defeated)

সেই জাপান কুৎসিৎ হিংস্র ভঙ্গিতে চীনকে আক্রমণ করলো। কবি যখন চীনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেও নবজাগরণের নানা চিহ্ন দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। আজ চীনের এই দুর্যোগের দিনে তিনি চুপ করে বসে রইলেন না—প্রথমে চীনের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে একটি চিঠিতে লিখলেন যে জাপান পাশ্চাত্যের অনুসরণে উন্মত্ত হয়ে প্রাচ্য জাগরণের বিপুল

সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে আর ব্যর্থ করেছে বুদ্ধের শিক্ষা। তার আপাতঃ সাফল্য তাকে ধুলায় টেনে নামাবে।

Japan has cynically refused its own great possibility, its noble heritage of 'Bushido' and has offered a most painful disillusionment to us in an unholy adventure through which even some apparent success of hers is sure to bend down to the dust, loaded with a fatal burden of failure.

এই চিঠি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। জাপানের কবি নোগুচির চোখে পড়লে তিনি উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে একটি খোলা চিঠি লিখলেন। 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া' এই ধ্বনি তুলে বোঝাতে চাইলেন যে এশিয়া মহাদেশে একটি নূতন জগৎ গড়ে তুলতে হলে এই যুদ্ধ অনিবার্য। আত্মদানের ব্রত নিয়ে জাপানী তরুণ সৈনিকেরা যুদ্ধ করছে, তাদের তো প্রশংসাই করা উচিত।

Believe me, it is war of 'Asia for Asia.' With a crusader's determination and with a sense of sacrifice that belongs to a martyr, our young soldiers go to the front.

নোগুচির এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখলেন তা চিরকালের যুদ্ধবাদীদের প্রতি কবির প্রদীপ্ত সতর্কবাণী হয়ে থাকবে। কবি সেই চিঠিতে কয়েকটি কথা জোর দিয়ে বললেন—প্রথমত এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া এ তত্ত্ব তিনি মানলেন না, দ্বিতীয়ত শিল্পী ও চিন্তাশীল মনীষীদের আশ্চর্য নীরবতার উল্লেখ করলেন, তৃতীয়ত চীনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বাস জানালেন। সম্পূর্ণ পত্রটি উদ্ধার করতে পারছিনা স্থানাভাবে কিন্তু উপরের তিনটি কথার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধার করছি—

When you speak, therefore, of 'the inevitable means, terrible it is though, for establishing a new great world for Asiatic Continent' signifying I suppose the bombing on Chinese women and children and the desecration of ancient temples and universities as a means of serving China for Asia—you are ascribing to humanity a way of life which is not even inevitable among the animals and would certainly not apply to the East

inspite of her occasional aberrations. You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skulls.

দ্বিতীয়ত তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন সেই সব ইনটেলেকচুয়ালদের কথা যারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন—

What is not amusing is that artists and thinkers should echo such remarkable sentiments that translate military swagger into spiritual bravado. In the West, even in the critical days of war madness, there is never any dearth of great spirits who can raise their voice above the din of battle, and defy their war-mongers in the name of humanity.

শুধু জাপানী চিন্তাশীল ব্যক্তি বা কবি ও শিল্পীদের কথা বলেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না। বিশ্বজোড়া ভীরুতার প্রতি তীব্র ভর্ৎসনাও তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল—Unfortunately the rest of the world is almost cowardly in any adequate expression of its judgement owing to ugly possibilities that it may be hatching for its own future. অবশেষে চীনের দুর্জয় শক্তির প্রতি আস্থা রেখে বল্লেন—no temporary defeats can ever crush her fully roused spirits.

নোগুচি এর উত্তর দিলে রবীন্দ্রনাথ আবার তার উত্তর দেন। এবারের চিঠিতে তাঁর ক্ষুব্ধতা বেশ রূঢ়ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে জাপানের সম্বন্ধে আর গর্বভরে লোকের কাছে বলতে পারছেন না সেকথা উল্লেখ করে বল্লেন,—I can no longer point out with pride the example of a great Japan. জাপানের জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা জানিয়েও তিনি কঠোর ভাষায় বলেছিলেন—wishing your people whom I love not success but remorse.

১৯৩৮ সালের ৮ই জানুয়ারী লিখলেন বুদ্ধভক্তি। সে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে নবজাতকে। খবরের কাগজে পড়লেন জাপানি সৈনিক বুদ্ধমন্দিরে যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে পূজা দিতে গিয়েছিল। যে বুদ্ধের

শান্তিবচনকে জাপান তার জীবনব্যাপী সাধনার মূলমন্ত্র করেছে বলে কবির মনে হয়েছিল-সেই জাপানে বুদ্ধের এই অপমান দেখে ব্যথিত কবি বললেন, 'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ মারছে বুদ্ধকে।' বুদ্ধের এই অপমানে, ভক্তদের হাতে তার এই লাঞ্ছনায়, তিনি কতদূর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত তা 'বুদ্ধভক্তি'র তীক্ষ্ণ ভাষা ও ব্যঙ্গেই প্রমাণ—

গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্ত রোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন ;
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি আঘাত
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।

এ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, ভারতবর্ষের নন ; সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানবতা তাঁর ভাষায় নিজের প্রকাশ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতেই আর একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটলো যার ফলে কবির লেখনী আবার মুখর হয়ে উঠলো। ১৯৩৮ সাল। হিটলার প্রবল হয়ে উঠেছে। তার বিশ্বগ্রাসের পরিকল্পনা বেশ স্পষ্ট হয়েছে। চেকোস্লাভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলে জার্মান অধিবাসীদের সংখ্যা অল্প ছিল না। তারা নাৎসি উৎসাহে সুদেতান অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বসলো। সুবিধাবাদের সহজ পথে প্রবল শত্রুকে খুসী করবার জন্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির হাতে সুদেতান তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দিল। জার্মানিতে তিনি নিজে রাজার মত সম্মান পেয়েছিলেন সেই জার্মানি আজ উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পরিচালনায় আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়েছে আর ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ছোট ছোট দেশগুলির স্বার্থ স্বচ্ছন্দে বলি দিচ্ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার অধ্যাপক লেসনীকে তিনি লিখলেন, ১৫ই অক্টোবর

১৯৩৮ সালের সে চিঠি তাঁর উদার মানবতাবোধের বলিষ্ঠ প্রমাণ—I feel so keenly about the suffering of your people as if I was one of them. For what has happened in your country is not a mere local misfortune which may at the best claim our sympathy, it is a tragic revealation that the destiny of all those principles of humanity for which the peoples of the West turned martyrs for three centuries are in the hands of cowardly guardians who are selling it to save their own skins. It turns one cynical to see the democratic peoples betraying their kind when even the bullies stand by each other.

I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this, humiliated to see all the values, which have given whatever worth modern civilization has, betrayed one by one, and helpless that we are powerless to prevent it. Our country is itself a victim of these wrongs. My words have no power to stay the onslaught of the maniacs, nor even the powers to arrest the desertion of those who erstwhile pretended to be the saviours of humanity.

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে কবি জানালেন তাঁর লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতার কথা। তিনি লিখছেন যে এই কবিতায় my outraged sentiment has found its expression. You may use it as you like. কয়েক মাস পরে আর একটি চিঠি লিখলেন, তাতে চেকোস্লাভাকিয়ার অধিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সাফল্য কামনা করলেন। ইউরোপ প্রত্যাগত নেহরুর কাছ থেকে তিনি চেকোস্লাভাকিয়ার ঘটনা আগ্রহভরে শুনে লেসনীকে লিখলেন —Let me only hope, your brave people will not lose heart and you will not fail to rebuild once again your own future.

প্রায়শ্চিত্ত কবিতা বহুল প্রচারিত। ম্যুনিকের চুক্তির অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই লেখা। বিশ্বের আকাশের সমস্ত নীলিমা-হরণ-করা আসন্ন দুর্যোগের কালো ছায়ায় পীড়িত ব্যথিত কবি শুধু বুকের ব্যথাই প্রকাশ করলেন না, নবজাগরণের সুনিশ্চিত আশ্বাসবাণীও আমাদের তিনি শোনালেন—

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে
ক্ষুধাতুর আর ভূরীভোজীদেব নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুঠের ধন।

কিন্তু এই ভয়াবহ বিভীসিকার পাশেই রাখলেন আশ্বাসবাণী—

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে জাগিবে নূতন দেশে।

যুদ্ধ সমাপ্তির আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ একথাগুলি শুনতে পায় নি। জেনেছে যুদ্ধের পর।

এর কিছুদিন পরে কবিকে কানাডার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখতে হলো। কানাডাকে উদ্দেশ্য করে লেখা সেই কবিতাটি 'আহ্বান' নামে নবজাতকে স্থান পেয়েছে। এ কবিতা লেখার সময় কবির মনে নিশ্চয়ই বন্ধু পরিত্যক্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা মনে ছিল। তিনি কানাডাকে মুক্তি যুদ্ধের বীর বলে আহ্বান করে সতর্ক করছেন—

মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিয়ে রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে করোনা পরিহাস
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলির পদে দুর্বলেরে কোরোনা বলিদান।

অবশেষে কবি আর একবার ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যখন তিনি দেখলেন ফিনল্যাণ্ডের মত একটি ছোট্ট দেশকে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করেছে। সোভিয়েট সম্বন্ধে তাঁর গভীর আশায় কি প্রচণ্ড আঘাত সেদিন লাগলো। 'সানাই' কাব্যের অপঘাত কবিতা তারই সাক্ষ্য। একটি স্নিগ্ধ দিনের সমস্ত স্বপ্ন এক মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। যখন ভাঁটিফুলের মৃদুগন্ধে চৈত্রের নেশা ছড়ায়, জারুলের শাখায় ডাকে কোকিল—

টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

ফিনল্যাণ্ড অতি ছোট দেশ কিন্তু আত্মগঠনে তার নিষ্ঠা ও দুর্জয় সাধনা কবির সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'ফিনল্যাণ্ড' নামে তাঁর একটি রচনা ১৩৪৬ মাঘ সংখ্যা অলকায় প্রকাশিত হয়। কবি বলছেন, "এতদিন পৃথিবীর কমজানা দেশগুলির মধ্যে ফিনল্যাণ্ড ছিল একটি। আজ ইউরোপে ইতিহাসের যে সব অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিল, তার মধ্যে একটি প্রস্রবণ ঐ ছোট্ট দেশটিতে আপন কেন্দ্র আশ্রয় করেছে। তারই দহন জ্বালায় বিশ্বসমক্ষে ফিনল্যাণ্ড আজ হঠাৎ উদ্ভাসিত।...হেলসিঙ্কি ফিনল্যাণ্ডের একটি বিশিষ্ট রাজধানী, শোভা সৌষ্ঠবে অসামান্য। সোভিয়েটরা গোলা বর্ষণে সেটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিলে।" ফিনল্যাণ্ডের শ্রীবৃদ্ধির উল্লেখ করে কবি উপসংহারে মন্তব্য করলেন—"যুদ্ধের শেষ ফল কি হবে জানা নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা এক অতিকায় দানবকে হিম সিম খাইয়ে দিচ্ছে—রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কবিতাকে মনে না করে পারি না। সেটি হলো আফ্রিকা। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশটিতে পশ্চিমী সভ্যতা যে জঘন্য ব্যবসার খেলা খেলতে সুরু করেছে তার শেষ আজও হয়নি। শুধু লোভ, শুধু মুনাফার আকর্ষণেই এই বিরাট বিস্তৃত ভূখণ্ডে কি বর্বরতার অনুষ্ঠান দিনের পর দিন হয়ে চলেছে। কবি চুপ করে থাকেন নি। ধর্ষিত মানবতার প্রতি তাঁর সমবেদনা তীব্র ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে এই কবিতায় মূর্ত হয়েছে। আফ্রিকার উপরে এই নির্যাতনকে তার ইতিহাসের একটি অপমানিত অধ্যায় বলে কবি মনে করেছেন,

পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সেদিনের পশ্চিম দিগন্ত ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস, হিংস্রতার মদ মানব-

জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপচে পড়ছে, এরই মধ্যে কবি সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী এনেছেন এই অপমানিতা মানবীর কাছে—'ক্ষমা করো।'

এই সময়েই একটি চিঠিতে কবি নিজের মনোভাব প্রকাশ করছেন, পরাজিতের পক্ষ সমর্থনে,—"দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্য শক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগলো জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুৎসিৎ অপমান বার বার স্বীকার করলো যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্য শক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসিনিয়কে ইটালীর হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করলো জার্মানীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইনটরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে।"

(অমিয় চক্রবর্তীকে লখা—২০-৯-৩৯-এর চিঠি)

এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধের দিক থেকেই এই সমস্যাগুলিকে বিচার করেছেন—সেখানে কোন পক্ষের শক্তি বা দুর্বলতা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। আজ যখন পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রবল উদ্ধত হয়ে উঠছে তখন প্রতিবাদের জোরালো কণ্ঠ কই। এ আশংকা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন যে বুদ্ধিবাদী চিন্তাশীলেরা শক্তিমানের পায়ে মাথা খুঁড়বে—তা আজ সত্য হয়েছে। আফ্রিকার ধর্ষণ আজও চলেছে; মধ্যএশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া, তিব্বত, এলজিরীয়া; হাঙ্গারী আজও বিধ্বস্ত, লাঞ্ছিত। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শুধু কোমলতার কবি বলে জানেন এই রচনাগুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আজিকার দিন না ফুরাতে

ভালবাসার খেলা নদীর স্রোত নয়—একতরফা খেলা চলে না। তার সঙ্গে সমান তালে চলবার আর একটা স্রোত চাই। কিন্তু তার মানেই এই নয় পরস্পর পরস্পরের জন্যে আকুল হয়ে ভাবে গদগদ হয়ে উঠবে তবেই ভালবাসা হবে। তা নয়, পরস্পরের মধ্যে মনের মিল নাও থাকতে পারে, তবু একটা সম্পর্ক থাকা চাই, সেটা অবহেলার হোক, প্রত্যাখানের হোক, স্বীকৃতির হোক, গ্রহণের হোক—সম্পর্ক একটা চাই। ভালবাসার মধ্যে মিলনের অংশটা খুবই প্রবল—সন্দেহ নেই। যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে মিলিত হতে চাই। সে মিলনের জন্য আরও অনেক মূল্যবান বস্তু ত্যাগ করতে পারি; প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের বহু সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠি।

তবু মানুষ যখন কাব্য লেখে তখন প্রেমের মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যত লেখে যথার্থ মিলন নিয়ে তত লেখে না। তার চেয়ে ঢের বেশি লেখে বিরহ নিয়ে বিচ্ছেদ নিয়ে ব্যর্থতা নিয়ে। যা পাওয়া যায় তার জন্যে তত ব্যাকুলতা নেই, যা না পাওয়ার তার জন্যেই মানুষ ছটফট করে মরে। তাই না-পাওয়া নিয়েই তার কাব্য তার গান। সেখানে মানুষ তার স্বাভাবিক স্তরকে ছাপিয়ে ওঠে। সংসারে জন্তু মাত্রেই পেলে খুশী; না পাওয়ার মধ্যেও রস খুঁজে বার করতে পারে শুধু মানুষ, বর্তমানের হলাহল থেকে যে ভবিষ্যতের অমৃত মন্থন করতে জানে। তাই মানুষ ভালবেসে বেদনা বহন করে। চাওয়া মাত্রই যাকে পাওয়া গেল না তাকেও যে পেতে পারি এই অসীম আশার বার্তা বহন করে মানুষ বেঁচে আছে। বাইরে না পাই ভিতরে পাব, পাব আমার কল্পনায়, পাব আমার দুঃখে বেদনায়। মানুষের কাছে ভালবাসা শুধু একটা অন্ধ ইমোশন নয়, তার সচেতন মনের সৃষ্টি।

তাই মিলনেও যেমন কাব্য বিরহেও তেমনি কাব্য। রামগড় পাহাড়ের গায়ে রূপদক্ষ দেবদীন একটি সংক্ষিপ্ত পদরচনা করেছিলেন—

সুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদীন নম লুপদখে

কল্পনা করতে পারছি, কোন অতীতকালে এক সূর্যস্নাত দিবসে বারাণসীবাসী রূপদক্ষ দেবদীন তার প্রেয়সী সুতনুকার কাছে প্রেমনিবেদন করেছিল। সুতনুকা দেবদাসী,—হয়তো হেসেছিল তির্যক দৃষ্টিতে, হয়তো দেহের ললিত ভঙ্গিতে ছিল আমন্ত্রণ, হয়তো জালবিস্তার করেছিল অপরূপ সুর মাধুর্যের। অনভিজ্ঞ শিল্পী ধরা দিয়েছিল, ভুলেছিল আপনাকে। তারপর নানা প্রশ্রয়ে, নানা আহ্বানে সাহস বাড়লো একদিন। মেঘমেদুর আকাশ, ভবনশিখরে নেচেছে ময়ূরী। আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মোহ যখন ঘনিয়ে এলো, দিন রাত্রির মতো কালো হলো, অন্যমনা দেবদাসীর নৃত্যে ছন্দ পতন হলো বার বার। মূঢ় দেবদীন অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগ বাক্যের স্রোতে ভাসিয়ে দিলে।

তারপর সেই ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে, মুহুর্মুহু অশনিপাতের মধ্যে যে ভীষণ কথা শুনতে হলো তাকে, তার কালো এই আকাশের কালোকে লজ্জা দেয়। পরদিন প্রভাতে বারাণসীর পথে আবার নাগরিকের দল চললো চঞ্চল চরণক্ষেপে, শ্রেষ্ঠির দল খুলে বসলো পণ্যবিপনি, গঙ্গাস্নানে চললো দলে দলে পুণ্যলোভী রমণীর দল। নির্মল সূর্যে জলধারায় লক্ষ মানিক জ্বলে উঠলো। তখন বারাণসী থেকে দূরে চলেছেন দেবদীন। লিখেছেন, পর্বতগাত্রে সুতনুকা নামে দেবদাসীকে কামনা করেছিল দেবদীন নামে এক রূপদক্ষ।

এই যে কবিতা, মাত্র তিন লাইনের—তবু কি তীব্র এর আবেদন। এ হলো না-পাওয়ার কাব্য, চিরন্তন বিরহের কাব্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রূপদক্ষ দেবদীন এই প্রত্যাখ্যানে বিচলিত হয়নি। অতি প্রশান্ত ভদ্রতার সঙ্গে সে এই প্রত্যাখ্যানকে মেনে নিয়েছে। ভালবাসার জগতে এই আচরণ বীরের আচরণ। কান্না নয়, খেদোক্তি নয়, ব্যর্থতায় ভেঙ্গে

পড়া নয়, সরল সাহসে ও বলিষ্ঠতায় নিজের দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো—এ কাজ কজন পারে।

রূপদক্ষ দেবদীন সেই কাজই করেছিল। এই দেবদীনকে পেলাম দুহাজার বছর পার হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। মহুয়া, পূরবী, সানাই কাব্যে দেবদীনের ছায়া খুঁজে পেলুম। সেই সুতনুকার মত নায়িকার দল আজও প্রত্যাখ্যান করছে, দেবদীন নিজের বেদনার আগুন নিজের বুকেই বহন করে বলছে—

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে···
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে।

কিন্তু এই বিরহ আর বিচ্ছেদ এক জিনিস নয়। এ বিরহ অতি নিবিড় নৈকট্যের মধ্যেও বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আনে। এর কোথাও কোন পাওয়ার চিহ্ন নেই। আর বিচ্ছেদের কবিতায় একটা মিলনের সুর আছে। একদিন যে কাছে ছিল, আজ সে কাছে নেই, কিংবা আজ যে কাছে নেই সে কি কাল আসবেনা—এই ভাবনাই বিচ্ছেদের কবিতার সুর। প্রাচীন অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ্‌ কবিতায় রয়েছে—

সো মহা কান্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চেলাএ॥

'আমার সেই কান্ত এখন দূর দিগন্তে, বর্ষা এসেছে চিত্ত চঞ্চল হয়েছে।' এ কবিতায় বিচ্ছেদের-দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয় কান্ত বর্ষার দিনে কাছে নেই এ তারই বেদনা। বিরহের গভীরতার কাব্য এ নয়। এরই পাশে রামগড় পাহাড়ের সুতনুকার লিপি বিরহের গভীর শান্ত বেদনার সুর এনে দেয় মনে।

কিংবা সেক্সপীয়রের সেই কবিতা—

By absence this good means I gain,
That I can catch her where none can watch her,
In some close corner of my brain

There I embrace and kiss her ;
And so I both enjoy and miss her.

ছিল সে, আজ নেই। তাতে কি হলো, আজ তো মনে মনে তাকে স্বষ্টি করি, মনে মনে তাকে আলিঙ্গন করি, তাকে চুম্বনে আচ্ছন্ন করি, হারাই আবার পাই। এও নিছক বিচ্ছেদ। একদিন ছিল, আজ তার সঙ্গে বিচ্ছেদ।

আধুনিক কালে ব্যক্তি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি বিরহের পটভূমিকায় প্রকাশ পেলো হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে। তাঁদের কবিতায় বিরহের গভীরতম উপলব্ধির সুর বাজে নি। বিচ্ছেদজনিত হাহুতাশ অত্যন্ত প্রবল-ভাবে আছে—তার সঙ্গে মাত্রাহীন অশ্রুপাত, দীর্ঘশ্বাস, মর্মভেদী হাহাকার কাব্যের বোঝা বাড়িয়েছে। কোন সুকুমার অনুভূতি, বেদনাজয়ী মহৎ পৌরুষের কোন প্রকাশ তাঁদের কাব্যে নেই। নিতান্ত দুর্বল নিতান্ত ভাবোদ্বেল এই প্রেম। হেমচন্দ্রের প্রেমের প্রায় সব কবিতাই ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের সুরে ভরা। সে সুর এত স্থূল এত মোটা অনুভূতির যে ভাল কাব্য তা থেকে হওয়া সম্ভব নয়। যেমন—

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয়রে!
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে!
তারে ত পাবার নয় তবু কেন মনে হয়
জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিবাই রে!
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।

নবীনচন্দ্রের কবিতা এর চেয়ে সুকুমার নয়। সীমাহীন প্রগলভতা তাঁর কোন কাব্যকেই গীতিকাব্যের মর্যাদালাভ করতে দেয়নি। তবু তাঁর কবিতা থেকে এমন একটি ভাব উদ্ধৃত করছি যেটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ভাবগত মিল আছে ; কিন্তু রচনার পার্থক্যে তাদের মূল্য কত পৃথক। যে প্রেম মনের মধ্যে গোপনে আছে, যাকে প্রকাশ করলে দুঃখ বাড়বে প্রেয়সীর, সেই প্রেমের একটি কবিতা নবীনচন্দ্রের কাব্যে আছে। প্রেম সার্থক হয়নি, মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই, এমন

অবস্থায় বুকভরা হতাশায় প্রেমিকের কাতর আর্তনাদ 'প্রতিমা বিসর্জন' কবিতায় শোনা গেল। মনের ভিতর ভালবাসার প্রবল হয়ে ওঠা স্রোতকে প্রেমিক কেবলই গোপন করতে চায়। কিন্তু প্রথমাংশের এই বলিষ্ঠ সুর শেষ পর্যন্ত রইলো না, ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় প্রেমিক প্রাণ দিতে চায়। নবীনচন্দ্রের কবিতা—

যখন নিরখি তব কোমল অধর ;
বিমোহিত মন অলি কাঁপে থরথর
কিন্তু তারে প্রবোধিয়ে করি নিবারণ
কি কাজ সে সুখে যাহা দুখের কারণ
যুগল কমল কলি কোমল কিরণে,
ফুটাইতে কররন্তে সাধ হয় মনে
কিন্তু পুন ভাবি যদি হৃদয়ে তোমার,
এ পাপ পরশে হয় দুখের সঞ্চার।
এই ভয়ে মনোভাব মনেতে লুকায়,
যথাক্ষুদ্র বারিবিম্ব সাগরে মিশায়।

সন্দেহ নেই এ কবিতা বিরহের কবিতা। এই সঙ্গে মনে করুন পূরবীর 'আশঙ্কা' কবিতা। এখানে নায়িকা প্রবল শক্তিশালিনী, কবি তাকে তপস্বিনী বলেছেন। তার প্রেমের হোমাগ্নিতে নায়ক কি আহুতি দেবে! রবীন্দ্রনাথের নায়ক বলছে—

পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে।

—এ কবিতার নায়কনায়িকার কোমল অধর দেখে চঞ্চল নয়, যুগল কমল কলি কররন্তে ফোটাবার সাধ তার নেই, প্রেম তার অন্তরের গভীর ভাবের সামগ্রী। এখানে সমাজ বাধা দেয় নি, নায়কনায়িকার নিজের ভিতরেই বাধা। এ ভালবাসা প্রত্যাখ্যানের তীব্রতা সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধার

নিবিড় সূত্রে বাঁধা। এখানে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে নৈরাশ্যের বুকভরা জ্বালায় প্রেমিক পাগল হয়নি—নায়ক নিজেই সরে যাবার সময় বলছে—

তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমায় দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নবীনচন্দ্রের দিনে যা ছিল পূরবীর যুগে তা ছিল না। এখানে সমাজের ভয় আর মিলনের বাধা নয়। প্রেমের গভীরতায় এই বিচ্ছেদ তারা নিজেরাই মেনে নিয়েছে।

প্রেম পরস্পরের মধ্যে স্বীকৃত, তারপর এলো বিচ্ছেদ বা বিরহ—এতো চিরকালের কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রেমই স্বীকৃত হলোনা, একপক্ষ উদাসীন অপরপক্ষ বেদনা বহন করে ধৈর্য ও শান্তির সঙ্গে—এ অবস্থার কবিতা কই। তাই তো দেবদীন থেকে সোজা চলে আসি পূরবী, মহুয়া, সানাই-য়ের কবির কাছে। সেই নায়কনায়িকার দেখা পাই যারা তাদের প্রেমের ডাকে সাড়া পায় নি। কিন্তু তারা ভেঙ্গে পড়েনি, তাদের ভালবাসার লোককে অভিশাপ দেয়নি। মনের ভিতর তাদের আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জাগেনি, অত্যন্ত শান্তভাবে, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে নিজের বিচ্ছেদের মধ্যে, নিজের বেদনার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে। একটি অত্যন্ত উচ্চগ্রামে বাঁধা প্রেমিকের চিত্ত—সে প্রেমিক ভদ্র, শক্তিশালী, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এবং সবচেয়ে বড় কথা নিজের ব্যর্থতা সম্বন্ধে যার মনে কোন আত্মধিক্কার নেই। যৌবনের উচ্ছল দীপ্তির উন্মাদনা নেই। এই অবস্থা তত উজ্জ্বল নয়, তত বর্ণচাতুর্য এর মধ্যে প্রকাশ পায়নি কিন্তু এর শান্তি এর সৌন্দর্য অনেক ধীর, স্থির, অনেক গভীর। 'তোমাতে আমাতে বহিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে' এই পর্বের কথা নয়। এবারের সুর, যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে পড়িত তোমার দান এ মাটি লভিত প্রাণ।'

পূরবীর 'বিস্মরণ' কবিতার কথা মনে পড়ছে। কবে কে দিয়েছিল ফুল সে কথা মনে নেই। মনে যদি নেই তবে কেন মিথ্যে মোহে ওকে ধরে রাখা। ভুলে যাওয়ার ছিদ্রপত্র খোলা থাকলে তবে তো জীবনের ভার কমবে। 'বিস্মৃতির ছিদ্রপথ দিয়া আজও কি সে হয়নি বাহির'।

স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা তো শক্তির লক্ষণ নয়, বীরত্বের লক্ষণ নয়। বিস্মৃতির ছিদ্রপথে বিস্মরণীয় যখন চলে গিয়ে পথ করে দেবে তখনই তো নতুন স্মরণীয় আসবে।

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
সে ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তাকে সাজিয়ে রাখাই ভুল—
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে।
ধুলায় তারি শান্তি তারি গতি
এই সমাদর কোরো তাহার প্রতি—
সময় যখন গেছে তখন তারে
ভুলো একেবারে।

তারপর 'আশঙ্কা'—কি আশ্চর্য গভীর ভাবের সমুদ্র। তোমার কাছে ধরা পড়ে আমার ফাঁকি, তুমি অনেক গভীর, অনেক শান্ত। তুমি যে তপস্বিনী, তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে হবি হবে এমন কি আছে আমার। প্রেমিক নিজেই বুঝেছে যে এ প্রেমিকা তার অন্তরে নিবিড় গহনে যে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে চলেছে সেখানে নিজেকে হাজির করে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে লাভ কি। তখন উপায় কি রইলো—ফিরে যাওয়া, তপস্বিনীর সাধনায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ফিরে যাওয়া। নিজের কথা নিজের বুকেই রইলো, ব্যথা পেলোনা প্রকাশ। নায়ক শক্তিমান, সে বলেছে—

হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে
তাইতো আমি বলি তোমায় নতশিরে,
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

দুজনের জীবনের সুর আলাদা, একথা জেনে প্রেমিক-প্রেমিকা প্রথম উন্মাদনার দিনে সরে গেছে ভদ্রতা রক্ষা করে এ উদাহরণ জীবনে কই।

যদি বা কোথাও মেলে কদাচিৎ, তবে এ কথা বলবো তারাই রামগড় পাহাড়ের দেবদীন, তারাই পূরবীর 'আশঙ্কা' কবিতার নায়ক-নায়িকা।

তারপর পূরবীর 'শেষ বসন্ত' কবিতা। মনে পড়ে ব্রাউনিঙের Last ride together. সব যখন জানা হলো, যখন বোঝা গেল 'হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে আমার সময় আর নাই', তখন কি প্রার্থনা? তোমার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলটল করে উঠবে, আমার মনের কোণে স্মৃতি থাকবে করুণারসে ভরা—এই কি প্রার্থনা। বিরহে কাতর নরনারী তো যুগ যুগ ধরে তাই চেয়েছে। ভুলে যাওয়া কথা শেষ মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে চঞ্চল চরণকে মন্থর করেছে। কিন্তু এখানে প্রেম সেই সহজ পথ ধরে চলেনি। এখানে ক্ষণিকের জন্য এই শেষ আবেশটুকু দীর্ঘায়িত করার কথা বলা হয়েছে—

শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

কিংবা— পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

এতো শেষ দেখাটুকু ক্ষণিকের জন্য নিবিড় করে তোলা। ব্রাউনিঙের নায়কও এত সহজে ভাগ্যকে মেনে নিতে পারে নি। সেও একটি স্মৃতি মনের গভীরে পোষণ করতে চেয়েছে—I claim only a memory of the same. আর একটি কথা আছে। ব্রাউনিঙের নায়ক বড় বড় সেনাপতি, রাজনৈতিক কবি, স্থপতি, গীতিকারদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে সান্ত্বনা পেয়েছে। কি পাবে ওরা? রাজমুকুট তো কতই আছে, বড় নেতা ইতিহাসে দশ লাইনে সীমাবদ্ধ, কবি কথা সাজায় কিন্তু কি পায় জীবনে। গীতকার গান বাঁধে, যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে 'in music we know how fashions end.' আর আছে স্বর্গের সান্ত্বনা। কিন্তু

শেষ বসন্তের নায়ক এসব কোন সান্ত্বনার কথাই ভাবেনি। তার সান্ত্বনা তার অন্তরে। সে নায়িকাকে ভরসা দিচ্ছে—'দেরি করিব না মিছে, ফিরে চাহিব না পিছে।' এবং এই ক্ষণিকের পাওয়াটুকু ফুরিয়ে গেলে সে সহজ সুরে বলছে—'তারপরে যেয়ো তুমি চলে ঝরাপাতা দ্রুতপদে দলে।'

এই পাওয়া না-পাওয়া তত্ত্বের আর একটি কবিতা 'বিপাশা'। মায়ামৃগীর মত চমক লাগায় কিন্তু প্রেমের ফাঁদে ধরা দেয় না। সমাজ এ নারীকে কি চোখে দেখবে—যে শুধু খেলে, ধরা দেয়না কোথাও। নীতির বিচারে সে নারীর কি মর্যাদা। তারই রূপ ফোটাতে কবির ভাণ্ডার উজাড় করে বাণী এলো। প্রেমের ফাঁদে ধরা না দেওয়ার সঙ্গে তুলনা হলো 'ফাগুনরাতে চোরা মেঘে নাই হরিল চাঁদে।' কবি তাকে বললেন ঝরণার মতো মুক্ত, শরতের অরুণ আলোয় ছোঁওয়া মেঘ। সে বিপুল অনন্ত শূন্যপথে মনে মনে আকাশ পার হয় কিন্তু বুকের মধ্যে অশ্রুজলের ভার বয়না। সঙ্গী তার আছে অনেক কিন্তু মন তার কোন্ নিরাসক্তির সুরে বাঁধা—

যারা তোমার সঙ্গকাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে
ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।

এই নায়িকায় যার মন পড়েছে সেও জানে যে এ জিনিস পাবার নয়। বাসনার স্পর্শ দিয়ে একে বেঁধে রাখার কোন উপায় নেই। তাই তার আকর্ষণে মন আমার উৎসুক হলেও 'চাই না তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে।'

পূরবীর এই কবিতাগুলিতে প্রেমের একটি ধারা দেখেছি। 'বিস্মরণে' আজ যদিও মন ভারমুক্ত কিন্তু একদিন প্রেম ছিল; 'শেষ বসন্তে' আজ সব চুকিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া, কিন্তু প্রশ্রয় কি ছিলনা কখনো; না থাকলে চলে যাওয়ার এই কাব্যই বা হয় কি করে। 'আশঙ্কা'য় প্রেম আছে কিন্তু প্রেমিকার ধ্যানমগ্ন তপস্যাকে আঘাত করার স্থূলতা নেই। 'বিপাশা'য় নায়িকা আছে, সে আশঙ্কার নায়িকার মত ধ্যানমগ্না

নয় সে চঞ্চলা তটবন্ধনহীন ঝরণার মত প্রেমের ফাঁদে ধরা দেবে না। তার সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার কোনই প্রশ্ন নেই।

এই যে নায়িকা, যে নির্মম, যে শুধু খেলে কি তার জীবনের অর্থ। ভালবাসা যার কাছে শুধু খেলা সে কি নিজের অন্তরে ভালবাসা কামনা করে না। তবে সে বাঁচে কি করে; দিনের পর দিন প্রেমের ললিত লীলায় কি তাদের ক্লান্তি আসে নি। এতো নির্মম এক অমানবীর ছবি। একে নিয়ে কবি ছবি আঁকেন কি করে। মহুয়ার 'হেঁয়ালি' কবিতায় এর উত্তর আছে। নায়িকা যাকে ভালবাসে তাকে জানতে দেয়না, তাকে কাঁদায়, তাকে দোলায় সংশয়ের দোলায়। 'দয়িতের মিনতিকে অভাবিত উচ্চহাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।' কি হতে পারে এর ব্যাখ্যা—নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ; নিজের চেতন মন যা করছে অবচেতন কি তার ঠিক উল্টোটাই চাইছে?—

কেন তার চিন্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা।
আপনি সে পারে না বুঝিতে,
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে
আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ;

এই নায়িকা নিজেও জানে না তার মনে এই পাগলামীর ঝোড়ো হাওয়া লাগে কেন? কিন্তু 'আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ'— এই কথাই তো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। এই নায়িকার আচরণের মোটামুটি ফলাফল—ছলনা।

সানাই কাব্যের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—বিমুখতা। প্রেমকে কেন স্বীকার করে না নায়িকা। পাহাড়ে নদী চলে আপন পথ ধরে, হঠাৎ কখন পথের পরিবর্তন হয় তার কেউ তো জানে না। সে নদীতে যদি কেউ পণ্য ভাষায় তাহলে সর্বনাশ। সে নদীকে যতই

ভালবাসুক কেউ, 'সে আমার' বলে আস্ফালন করা বৃথা। এই ছবিই তো সেই নায়িকার ছবি। তার এই বাঁধনহীন মন কত হৃদয় ভাঙ্গার কারণ হয়—

মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কি টানে বাঁকিয়া যায়।
সে তার সহজ গতি
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের যতই করুক ক্ষতি।

সেই হঠাৎ প্লাবনী নদী ভরা ফসলের ক্ষেতের খাতির করে না। যদি মনে করে থাকি যে পথে তার চলা উচিত সেই পথেই সে চলবে তাহলে বার বার তার কূল ভেঙ্গে সে আমার ভুল ভাঙবে। প্রেমের স্বাভাবিক রীতি এ নায়িকা মানে না। তাই ভরা হৃদয়ের দান অবজ্ঞাভরে অবহেলা করতে তার কোন দ্বিধা নেই। এই দুর্দাম নদীর এই অকারণ কলহাস্যবেগকে যদি খেলা বলে গোড়া থেকে মেনে নাও, তবে খেদ থাকবে না—এ যেন মাতাল হয়ে চলার চলতি কারবার—

এ খেলারে যদি খেলা বলি মানো
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জানো
তা হলে রবে না খেদ।

নায়িকা চরিত্রে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যে বোঝেনি তাকেই তো পাষাণে আছাড় খেতে হয়। একে শুধু ক্ষণিকের চলতি খেলা বলে মানা যায় না বলেই এত হৃদয় বিদারণের বাড়াবাড়ি। তাই অবশেষে বল্লেন, শুধু যদি মানব মনের রহস্য বলে মনে করতে পারো তবেই এস কাছে—

'সে আমারি' বলে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা
আলগা লীলায় নাই দেওয়া পাওয়া
দূর থেকে শুধু আসা আর যাওয়া
মানব মনের রহস্য কিছু শিখা

চতুর ভাষায় এ এক খেয়ালী নায়িকার কাহিনী—একে উদ্দেশ্য করে বলা শক্ত 'প্রাণের সাধন কবে নিবেদন করেছি চরণতলে।' যে নায়িকা

ছলনা করে আর যে প্রত্যাখ্যান করে তারা তো এক নয়। যেখানে প্রত্যাখ্যান সেখানে নিজের বেদনাকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন, নতুন মায়া, নতুন সৃষ্টি সম্ভব। আর যেখানে ছলনা সেখানে আশাভঙ্গের ব্যর্থতা আর দহন।

মহুয়ার কবিতাগুলি ঠিক এই জাতের নয়। কিন্তু প্রেম সেখানেও এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ উপলব্ধির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। মহুয়ার উজ্জীবন কবিতা এ কাব্যের সুর বেঁধেছে। তারপরের সব কবিতাই একটি শুচিশুভ্র সংযমের দৃঢ়সূত্রে বাঁধা। নানা বৈচিত্র্যের সুর সেখানে ঝংকৃত। কিছু ব্যর্থতা, কিছু পরাভব, কিন্তু আত্মঘোষণার কবিতা মহুয়ায় জায়গা পেয়েছে। পূরবীর নায়ক মুখফেরানো নায়িকার কাছে অনুনয় করেনি, পরাভবকে শান্ত ভদ্রতার সঙ্গে মেনে নিয়ে তার আন্তরিক শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। মহুয়ায় নায়ক অনেক বেপরোয়া। মুখ ফেরালেই সে ফেরেনা, সে যৌবন বলদৃপ্ত, নায়িকার কটাক্ষবাণে ভীত হবার পাত্র সে নয়। তার ঘোষণা 'জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে করিব আমি জয়।' কিন্তু যৌবনের শক্তির এই দাপট এ কি শুধুই শক্তির জবরদস্তী, একি জুলুম করে ভালবাসা আদায় করে। না পেলে একি বর্বর হয়ে ওঠে। কবি ঠিক শক্তির ঐ প্রকাশকে জায়গা দিতে চাননি একাব্যে। এই যে না পাওয়াকে পাওয়া, এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। ফিরিয়ে দিয়েছে মহাদেব, লাঞ্ছিত হয়েছে রূপ, যৌবন কিন্তু ফেরেনি, পার্বতী বসেছে তপস্যায়। জয় করেছে পরম তপস্বীকে। মহুয়ায় নায়ক বলছে, 'তোমার প্রেমে আমার অধিকার অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার।' সেই অধিকার সে কেমন করে কায়েম করবে। বৈশাখের দিনে মেঘ মুখ ফেরায় যেন অরণ্যকে সে চেনে না। অরণ্য ভয় পায়না, দিনের পর দিন কঠিন তপস্যায় সে মেঘ থেকে টেনে নামায় ধারা। আজ যদি ভালবাসা না দাও, যদি মুখ ফেরাও তবু কাল ভালবাসা দিতেই হবে। এ হলো মিলনের আর এক কঠিন রূপ :—

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে ;

ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি ফোটে না বলে ফুল
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন রাতের পরে রাতি—
শ্রবণ রহে পাতি ॥
কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন ;
পূর্ব-গিরি আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি ;
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী ;
নামিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি
অশ্রুবারি বন্যা নামে, ধরণী যায় ভাসি। (অপরাজিত)

দায়ভারমুক্ত প্রেমিক আছে মহুয়া কাব্যে। ক্ষণিকের জন্যে তার আসা, অনন্ত প্রেমের তার প্রতিশ্রুতি। তাকে পাওয়া যেমন সত্য তাকে হারানোও তেমনি সত্য! তাকে তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। পথের ধুলায় বাসা বাঁধার জন্য তার প্রেম ব্যাকুল নয়। তাকে নায়িকা স্মরণ করবে কিন্তু তার 'বিস্মৃতিতলে' নায়িকার স্থান।

আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতি তলে ॥

যা একদিন সহজে পাওয়া গেছে আজ তাকে আরও বেশি করে পাবার কোন

চেষ্টা করা বৃথা। প্রেমের মধ্যেও একটা গতি আছে, সামনের আকর্ষণে পিছনকে সে সহজে ভোলে।

নারীর ব্যক্তিত্ব বিস্তৃততর পরিধিতে জেগেছে মহুয়া কাব্যে। তার প্রেম আর শুধু বাসরকক্ষের সৌন্দর্যসাধনা নয়। দুঃখ যেখানে, ভয় যেখানে, বাধা যেখানে সেখানে প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী নারীর আবির্ভাব।

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে
তরঙ্গ গর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।

'মহুয়া' বিরহের কাব্য নয়। যে সুরে পূরবীর প্রেমের কবিতাগুলি বাঁধা 'মহুয়া'র সুর তার থেকে পৃথক। এখানে প্রত্যাখ্যান নয়, বিচ্ছেদ নয় তার উপরে যে মিলন তার কথা বার বার বলা হয়েছে।

'সানাই'কে বিরহের কাব্য বললে ক্ষতি নেই। বিরহের নানারূপ এই কাব্যে ফুটেছে। তার মধ্যে একটি কথা সর্বত্র সমানভাবে প্রবল—সে হলো আত্মজয়ের। প্রেমের দাবী যদি প্রবল হয়ে উঠে নিজের ক্ষুধাকে বীভৎস করে তোলে তা হলে সে প্রেম ব্যর্থ। তেমনি বিরহ যদি দয়িতের আচরণের প্রতি আমায় ক্ষুব্ধ করে তোলে, তা হলে প্রেমের শক্তি প্রমাণ হলো না। ভালবাসা যত গভীর, বিরহের বেদনা বহন করার শক্তিও তার তত বেশি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরেই প্রেমের এই আন্তরিক শক্তির কথা বলেছেন, দুঃখের মধ্যে, বিরহের মধ্যে সান্ত্বনা ও পরিণতি লাভের কথা মানুষের মনে সঞ্চারিত করেছেন। তাই মদনকে ভস্মশয্যা ছেড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। বীরের তনুতে অতনুকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। মহুয়ার কবিতাগুলির জাত ভাগ করার সময় বলেছেন যে একজাতের কবিতা আছে যেগুলিতে "প্রণয়ের প্রসাধন কলা মুখ্য।" তেমনি আর একটি জাত আছে যেগুলিতে "ভাবের আবেগপ্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল। 'সানাই'-য়ের প্রেমের কবিতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

পূরবী ও মহুয়াতে প্রেমের যে মিলনাংশটুকু আছে 'সানাই'তে তাও নেই। শেষবারের মত কাননে বসন্তের ফুল সঞ্চয় করতে যাব—এ কথা শোনবার জন্যেও কেউ নেই—এ শেষ বারেরও পরের কথা। এ কাব্য একান্তই বিরহের কাব্য। তবু দু-একটি কবিতা খুঁজলে পাওয়া যাবে যেখানে শেষবারের দেখা শোনা হচ্ছে। সেই শেষ মিলনের মধ্যে একটি গভীর আত্মনিবেদনের ভাব আছে। যে প্রেমের কোন অভিযোগ নেই, সে পেলে খুসী হতো, না পাওয়াতেও ক্ষুব্ধ নয় এ কবিতাগুলি তারই। উদাসি হাওয়ায় পথে পথে মুকুল ঝরে পড়েছে, প্রেমিক তাই কুড়িয়ে এনে বলছে, লহ করুণা করে। এ দুর্বলতা নয়, এ কৃপাভিক্ষা নয়, শেষ বিদায়ের আগে যুগল চিত্তের পারস্পরিক স্বীকৃতি। সেই ফুলগুলি নিয়ে দুজনে বসবে ফুলবিছানো ঘাসে 'কানাকানির সাক্ষী রইবে তারা, বউ কথা কও ডাকবে তন্দ্রাহারা।' তারপর যখন সেই একটি লগ্ন চলে যাবে তখন কোন দুঃখ কোন বেদনার কথা কাউকে না জানিয়ে বিদায় নিতে হবে—'স্মৃতির ডালায় রইবে আভাস কালকে দিনের তরে।' কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই দেখা শোনা সম্পূর্ণ শেষ হবার পর। তখন প্রেমের প্রকাশ কবির মনের নানা মায়ায়, গোপন বাসনায়।

এই কথার কবিতা 'অদেয়'—প্রেমের প্রসাধন ছিল, সত্য ছিলনা। দেবার সময় কৃপণতা করে, দৈন্যবশে সব দিইনি। সেই কৃপণতা যৌবনের অসম্মান, তার আঘাত নিজের উপরেই ফিরে আসে। তাই যখন বাইরের জগতে আনন্দের প্রবল স্রোত চলেছে তখন ফাঁকির শোধ উঠছে ভিতরে —এত বড় সংসারে নিজের একাকীত্বের কথাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। তারপর মনে এলো অনুতাপ, আমি না হয় ফাঁকিই দিয়েছি কিন্তু তুমি কেন আমার সেই ফাঁকিকে স্বীকার করলে। তুমি অভিমান করে চুপ করে রইলে—তাইতো ভালবাসা পথ পেলনা সার্থকতার। এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ি 'শেষ কথা।' এ কবিতায় বলেছেন, তুমি নানা ভাবের ছলনা করলে, দিলেনা কিছুই। জানি তোমার মনে প্রেম নেই, তবু তোমায় অবহেলা করতে পারিনি। আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ তুমি নিয়েছ। তোমার এই সংকীর্ণ কার্পণ্য তোমাকেই বঞ্চনা করবে—

কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান।
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

তত্ত্বহীন বিরহের কবিতা 'হঠাৎ মিলন'। একদা দুজনে অতি কাছাকাছি এসেছিল। তখন বলার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর আর দেখা হলো না, তখন নিজের বেদনাভরা অবকাশ কেমন করে ভরবে। একটি অনন্ত শূন্য বিরহীর কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে এসে দাঁড়ালো, তখন আপন মনে গান গেয়ে অর্থহীন মুহূর্তগুলিকে ভরে তুলতে হয়। 'স্বল্প' কবিতায় প্রেমিক গোড়া থেকেই তার চাওয়াকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। সে জেনেছে যে অনেকটা পাওয়াই থাকে মনে মনে, সবটাই হাতে মুঠো করে পাওয়া যায় না। রোমান্টিক প্রেমিক কিছু না চেয়েই নিজেকে মূল্যবান করে তুলেছে। নিজের ভালবাসা তাকে ভিতর থেকে এত পূর্ণ করে রেখেছে যে বাইরের প্রতিদানের অপেক্ষা সে করেনি। তাই প্রেমিক বলছে

যে দানে ভার থাকে
বস্তু দিয়ে পথ সে কেবল
আটক করে রাখে।

সানাই-য়ের গানগুলির মধ্যে বিরহের আরও কত সুর বেজেছে। আবেগতপ্ত ভালবাসার মুহূর্ত যার জীবনে আদৌ এলো না—প্রাণের সব সাধন নিবেদন করার পরও তাপের দিনে রসের বাদল নামেনি, মনের গভীর অনুভূতি বেদনার দহনে পবিত্র হয়েছে। একটি স্তবক মুক্তার মত ঝলমল করে উঠছে—

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান
এ মাটি লভিত প্রাণ,
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

কোন অভিযোগ নেই শুধু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যে যদি অবজ্ঞা না করতে তাঁহলে তোমার ভালবাসা তোমারই কাছে নানা ঐশ্বর্য হয়ে ফিরে যেতো। রোমান্টিক মনের নানা সুরের বিচিত্রতায় এই গানগুলি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। পঞ্চদশীর বক্ষে তিনি অশ্রুত বনমর্মর শুনেছেন। অগোচর চেতনার অকারণ বেদনার ছায়া তাঁর মনের দিগন্তে? যৌবনের পূর্ণ লাবণ্য নিয়ে এসেও নায়িকা চলে গেল। তার কাছে শুধু একটি প্রশ্ন, 'কেন বাধা হলো দিতে মাধুরীর কণা।'

একটি নম্র বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি আত্মসচেতন বলিষ্ঠতার সুর আছে এই কবিতাগুলিতে? প্রেমের শক্তির প্রকাশ তার বাইরে নেই। শক্তির ব্যবহার ভিতরে. প্রেমিক সেখানে ব্যর্থতার পরিণামকে অত্যন্ত সহজে মেনে নিয়েছে। ভালবাসা সত্য বলেই হাহুতাশ নেই, আত্মসংযত প্রশান্তি আছে। শুধু মিলন নয় যে ভালবাসার কথা শিল্পী দেবদীন পাহাড়ের গায়ে লিখেছিলেন তারই পূর্ণ প্রকাশ পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথে।

কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বছরকাল নানা ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আরও নানা কর্মের মধ্যে তাঁর অন্যান্য পরিচয় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নানা সৃষ্টিশীল কর্মে লিপ্ত থাকলেও এবং অধিকাংশ সময়েই জনতার উন্মত্ততা থেকে দূরে থাকলেও, বহু ধরণের কুৎসিৎ আক্রমণ সারা জীবন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর কাব্য, তাঁর গান, তাঁর গল্প উপন্যাস সবই ঈর্ষান্বিত সমালোচকদের আক্রমণের বিষয়বস্তু হয়েছে।

তিনিও অনেক সময়ে বিচলিত হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। দেশ তাঁকে গ্রহণ করেনি, অবিচ্ছিন্ন অসম্মান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে—এসব অভিযোগ তিনি প্রায়ই করেছেন। কিন্তু এই সব আক্রমণ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সময়ে সময়ে বিব্রত করলেও কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিরুত্তেজিত রেখেছেন, রক্ষা করেছেন নিজেকে সাময়িক কলহের উত্তাপ থেকে।

লোকমুখে যে খ্যাতিনিন্দার ঝড় ওঠে কবি যদি তার দ্বারা চালিত হয় তবে প্রতিমুহূর্তেই মনের বিকার প্রবল হতে থাকবে। জনদেবতার অর্ঘ্য যোগানোর দুর্বলতা একবার পেয়ে বসলে তার শেষ নেই। সস্তা হাততালির মোহ কবি বা লেখকের জীবনের ধারাকে বদলে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়স থেকেই নিন্দা-প্রশংসা সমান তালে পেয়ে আসছেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, ব্যঙ্গনাটক সবই তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি চিরকালই এমন কথা বলে এসেছেন যা তখনকার মানুষদের মনের মত নয়। তাতে তার জনপ্রিয়তা বেশি বাড়েনি, শত্রু বেড়েছে।

মানুষের জন্যেই তো সাহিত্যসৃষ্টি, পাঠকে পড়বে বলেই তো তার রচনা। সেই পাঠক সমাজের ভালমন্দ লাগাকে ছাড়িয়ে এমন কিছু কি লেখা চলে যার সঙ্গে সাধারণের সুর মেলেনা। সাধারণ মানুষের সুদীর্ঘকালের মতামত বিশ্বাস সব নাড়া দিয়ে সৎসাহিত্য কি রচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই সব প্রশ্নের আলোচনা করেন, সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনার উত্তর দিতে গিয়ে ;—

> কেবল একটি কথা আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে, সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য ফল যা তাও তাঁকে পেতে হয়েছে। তাঁর কাব্য সাধারণের রুচির পথ বেয়ে আসেনি, ফলে অভ্যর্থনায়, 'সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটেছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিলনা।' লোক ভোলানোর সহজ পথে মামুলী খ্যাতির আকর্ষণে মনোরঞ্জক সাহিত্য তিনি রচনা করতে পারেন নি :—

> কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময় লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুশি করা যায়—কিন্তু সেই খুশিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে—সেই সুলভ খুশির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

এই সুলভ খুশির মোহকে, নিজের কথাকে সাধারণের মনোমত অলংকরণের মোহকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা কখনোই প্রশ্রয় দেন না। নিজের সত্য উপলব্ধিকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার যে বিপদ সে তাঁরা কখনোই এড়িয়ে যেতে চাননি ; দেশ অবজ্ঞা করেছে ; দুঃখে দারিদ্র্যে লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় ভারি হয়েছে। সাধারণ মানুষের দলগত মনোভাবের সঙ্গে মৌলিক

স্রষ্টাদের সুর কদাচিৎ মেলে। এ কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিলনা। তিনি চোখের সামনে দেখেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা তো পাননি উপরন্তু যা পেয়েছেন তা জাতির লজ্জার কারণ হয়ে আছে। দেশের বহু আচার বিচার ও সংস্কারকে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। অপ্রিয় হবার সম্ভাবনা তাঁকে নিরস্ত করে নি :—

> যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই;—এইজন্য দুর্গতির দিনের যে কোন ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই,—এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অতিশয় মর্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন উপরের এই কথাগুলির সত্য প্রমাণ করছে। যাঁরা যথার্থ স্রষ্টা লোকরুচির হিসাব মেটানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অজস্র ঘটনা দেখা গেছে যেখানে সাধারণ মানুষের মনের মত কথা না বলার জন্য, সাধারণের বোধ ও বুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বে ওঠার জন্যে অনেক শক্তিমান স্রষ্টা সমকালীন বিচারে শুধু নিন্দা আর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপই পেয়েছেন। জনসাধারণের মনের মত করে লেখার কৌশল যারা আয়ত্ত করে নেয়, সমসাময়িক কালের কথাকে যারা সুযোগ বুঝে ব্যবহার করে নেয়, তারাই সহজে সাফল্য অর্জন করেছে—জীবিতকালের বহু সম্মানের সমারোহ তাদের মৃত্যুর পর ধূলিমলিন জীর্ণ স্মৃতির সমাদরও পায় নি।

ইতিহাস তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বেঁচে গেছেন তাঁরাই যাঁরা পাঠকদের মনের মত লেখা রচনা করেন নি, নিজের মনের মত লেখা পাঠকদের গ্রহণ করাতে চেষ্টা করেছেন।

বলা বাহুল্য, যথার্থ শক্তিমান লোক না হলে নিজের কথা বলবার দুঃসাহস সকলের হয় না। সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির প্রলোভন ত্যাগ করে তারাই যারা তাদের সাধনাকে হিসেবী উন্নতির পায়ে বিকিয়ে দেয়নি। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য, যে এমন বলিষ্ঠ স্রষ্টা একাধিক এসেছেন তার সাধনায়, যাঁরা লোকরঞ্জক নন, যাঁরা জনসাধারণকে খুসী করার জন্যে লেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা উপন্যাস রচনার কাজে হাত দিলেন সেদিন বাঙ্গালীর চিত্ত দৈন্যগ্রস্ত জড়ত্বের ভারে আচ্ছন্ন ছিল। বাংলা ভাষার মর্যাদা ছিলনা, কৌলীন্য ছিলনা। তখনকার ভদ্র সমাজ বাংলা উপন্যাস পড়ার জন্য খুব ব্যস্ততা দেখায় নি। সেদিনকার অবস্থা রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের আত্মবিশ্বাসী স্রষ্টাকে তার অসীম সাহস ও দৃঢ়তার পটভূমিকায় দেখালেন :—

> 'সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস, বিদ্রূপ, গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল এবং ক্ষুদ্র যে লেখক সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব এক যুগসন্ধিক্ষণে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলনের নানা সমস্যা তখন জাতির জীবনে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ মনীষা নিয়ে সেই উদ্‌ভ্রান্তির যুগে একটি বিশেষ চিন্তাধারাকে অবলম্বন করলেন। তাকে জনচিত্তের উপযোগী করে সাজানোর দুর্বলতা তাঁর ছিলনা। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেছেন, তা নির্ভীক ভাবে বলেছেন। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র তাঁর বন্ধু বৃদ্ধি করে নি। যাঁরা অবতার বাদে অবিশ্বাসী তাঁরা বঙ্কিমের ব্যাখ্যাকে সংস্কারদুষ্ট মনে করলেন আর যারা অন্ধভাবে শাস্ত্রবিশ্বাসী তাঁরা 'মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতা গঠনকার্যে বড় প্রসন্ন হন নাই।' রবীন্দ্রনাথ বলছেন :—

> এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিলনা, খড়্গধারিণীও ছিল।

এই খড়্গধারিণী বাণী সাধারণ পাঠকসমাজের খুব মনোরোচক হয়নি সেদিন যে অভ্যর্থনা বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন তাকে খুব সাদর অভ্যর্থনা বলা যায় না। কিন্তু সস্তা হাততালির প্রলোভনে লুব্ধ হবার মত জীর্ণপ্রাণ প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। তিনি যে খ্যাতির অভিমান পরিত্যাগ করে স্বভাষার উন্নতিকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ 'বীরত্বে'র পরিচয় সন্ধান করলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-শিল্পী নন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ—চিরকালের যথার্থ স্রষ্টাদের প্রতিনিধি।

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আছে, কবি নবীনচন্দ্র বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে, বন্দেমাতরম্ গানের ভাষা বাংলা-সংস্কৃত মিশ্রিত হওয়াতে তার আবেদন কমে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন লোকের ভাললাগার জন্যে নয়, নিজের ভাললাগার জন্যেই তাঁর লেখা।

তেমনি দেখলুম দুঃসাহসী মধুসূদনকে, বাংলা ব্যাকরণ ও তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যধারার রীতির প্রতি কি বিপুল অবজ্ঞা। যে নূতন ছন্দ, নূতন ভঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে এলেন তা দেশ তখন গ্রহণ করে নি। অতি শিক্ষিত মহলে সংশয়ের সঙ্গে তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ কিছুটা স্বীকৃত হয়েছিল। জনচিত্তে অমর হয়ে থাকবার বাসনা তিনি একাধিক কবিতায় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নিজের কবিত্বশক্তির পূর্ণ প্রকাশকে লোকরঞ্জনের দ্বারা সীমায়িত করে নয়। তাই মধুসূদনের শোকাবহ পরিণতি সেদিন দেশের জনমানসে কোন বিশেষ অনুতাপের বেদনা জাগায় নি। পরিত্যক্ত, অবহেলিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু প্রমাণ করছে যে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছান নি, পৌঁছবার চেষ্টাও করেন নি। তিনি মধুচক্র গড়তে চেয়েছিলেন 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' সে মধুচক্র তাঁরই গড়া, গৌড়জনের ভাললাগার দ্বারা তার গঠনকার্য প্ররোচিত নয়।

মহৎ প্রতিভার ব্যবহার সব সময়েই একটি রহস্যের দ্বারা আচ্ছন্ন। তার গতিবিধি, তাঁর সৃষ্টিকৌশল সবই বাইরে থেকে শুধু খেয়াল বলে মনে হতে পারে। অলৌকিক সৃষ্টি যে করে স্রষ্টা যে তার বক্ষে অপার বেদনা ভরে দিয়েছেন সে কথা স্থূল রুচি, দলবদ্ধ মানুষ বুঝবে কি করে। সাধারণ মানুষ মহৎ প্রতিভাকে চিরকালই সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ সে প্রতিভার দিগন্ত চিরকালের মত তাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এই অবস্থার কথা ধরে দিয়েছেন তাঁর The Art of literature গ্রন্থে—

Man of great genius, whether their work be in poetry, philosophy or art, stand in all ages like isolated heroes, keeping up single handed a desperate struggling against the onslaught of an army of opponents. Is not this characteristic of the miserable nature of mankind? The dullness, grossness, perversity, silliness and brutality of by far the greater part of the race, are always an obstacle to the efforts of the genius, whatever be the method of his art; they so form that hostile army to which at last he has to succumb. Let the isolated champion achieve what he may: it is slow to be acknowledged; it is late in being appreciated, and then only on the score of authority; it may easily fall into neglect again, at any rate for a while. Ever afresh it finds itself opposed by false, shallow, and insipid ideas, which are better suited to that large majority, that so generally hold the field.

সাধারণ মানুষ আর মহৎ প্রতিভার ভিতরে যে শুধু ভাবগত দূরত্ব তা নয় কালগত দূরত্বও আছে। তারা একই সময়ে জীবিত হলেও এক কালের মানুষ নয়। আজ যেটা চলতি হাওয়া, যেটা শুধুমাত্র ফ্যাশান, সেটা যখন লেখকের রচনায় ফোটেনা তখনই সাধারণের বিচার সে লেখকের বিরুদ্ধে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের মত রবীন্দ্রনাথের সুরও সমসাময়িক কালের সঙ্গে মেলেনি। মতামতের লড়াই তাঁকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লড়তে হয়েছে।

কাপড় পোড়ানো, অসহযোগিতা, চরকা প্রভৃতি যখন সমগ্র দেশের হৃদয়কে উত্তেজিত করছিলো তখন তিনি বার বার এগুলির প্রতি তাঁর অসমর্থন জানিয়েছেন এবং সমস্যাগুলির যে দূরবিস্তৃত সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দেশ তা অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্রাহ্মরা মনে করেছে নৃত্যগীতের সুরে বাঁধা এই জীবন যথেষ্ট ব্রাহ্মজনোচিত নয়, আর গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে হিন্দুদ্বেষী ব্রাহ্ম মনে করে মনে মনে দূরে রেখেছে। উভয় পক্ষই তাঁর কাব্যে তাঁর গানে শ্লীলতার অভাব দেখে নাসিকাকুঞ্চন করেছেন। তাঁর রচনাশৈলী প্রথম থেকেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ পেয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের মহত্ব সেইখানেই যে এসব কোন কিছুই তাঁর স্বষ্টির ধারাকে বদলে দিতে পারে নি। তাঁর চিত্রাঙ্গদা, তাঁর অচলায়তন, তাঁর ল্যাবরেটরী কি প্রচণ্ড সমালোচনার ঢেউ তুলেছিল।

কিন্তু কিসের জোরে তাঁর মত লেখকরা সাধারণের মুখের দিকে না চেয়ে কাব্যরচনা করেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। ব্যক্তির চেতনায় যারা বিশ্বাসী সমষ্টির চেতনায় তারা ততটা আস্থাশীল নন। ব্যক্তি এক জিনিস আর ব্যক্তিসমষ্টি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। একটি মানুষ নিজের বুদ্ধিতে চলে সমষ্টিবদ্ধ মানুষ ভাবের উন্মাদনায় চলে। সমষ্টি সত্যকে বিচার করে না, কোন একটা কিছুকে সত্য বলে মানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই বোঝেন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ভদ্র জিনিস নয়, কিন্তু যখনই সমবেত জনতা সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার ধ্বনি তোলে তখন ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও নিজেদের বিচারের কথা ভুলে স্রোতে ভেসে যান। জনসাধারণের এই চরিত্র। এ কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না—তাঁর অধিকাংশ নাটকের জনতা তা প্রমাণ করছে।

লোকের মনের মত করে লেখার একটি তীব্র সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ একবার করেছিলেন চন্দ্রনাথ বসুর 'কড়াক্রান্তি' প্রসঙ্গে। রচনাকাল ১২৯৯; উনবিংশ শতকের শেষ দশক। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ তখন প্রবল। সকল ব্যাপারেই দেশের কথা মহা সমারোহে ঘোষিত হচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদের একটা ধর্ম এই যে, স্বজাতীয় সবই ভাল এই অভিমান

তার প্রবল। পাশ্চাত্য প্রভাবকে রোধ করার নামে এক তরল হিন্দুয়ানি তখন সব কিছুর মধ্যেই বৈজ্ঞানিক সত্যের মনগড়া কাহিনী আবিষ্কার করছে। পাঠকেরা সে সময়ে ঐ সব কাহিনীর মধ্যেই দেশীয় গর্বের উপাদান সন্ধান করছেন। তখনকার হাওয়া ঐটেই। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে এই গতির বিরুদ্ধতা করা অপ্রিয় হওয়া। তবু তিনি 'বাংলার লেখক' প্রবন্ধে বল্লেন :—

> আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিম্বা কঠিন কর্তব্য-পালন তাহার নাম নাই—কেবল 'আহা উহু', কেবল কোলে কোলে নাচানো। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, কাঁদিয়া, মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়; অমনি তাহার মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যাণী মহা হাঁকডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে; এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মুঞ্চন করিয়া, তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।"

দেশের অবস্থা যেখানে এই সেখানে দেশের মুখ চেয়ে সাহিত্যলেখা দায়িত্বহীনতার লক্ষণ, ভীরুতার লক্ষণ। ১৩১৩ সালের সাহিত্যসম্মিলনে তিনি বলেছিলেন 'জনতা মহারাজে'র প্রতি তাঁর যথেষ্ট সম্মান আছে তবে 'কিঞ্চিত দূর হইতে'। তিনি একথা বিশ্বাস করতেন জনসাধারণ লেখার বা যে কোন মহৎ সৃষ্টির যথার্থ বিচারক নয়। দলবদ্ধ হয়ে সাহিত্য রচনার পদ্ধতিকে তিনি কখনো স্বীকার করতে পারেন নি। Collective emotion-এ সাহিত্য সৃষ্টি হয় আধুনিক কালের কোন কোন মহলের এই তত্ত্ব তাঁর কাছে আদৃত হয়নি। বাংলা সাহিত্যও যে কয়েকটি মানুষের একক চেষ্টার ফল তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাহিত্য সম্মিলনীর কি কোন যথার্থ প্রয়োজন আছে :—

> সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোন প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি।...সাহিত্য সাধনা যার যোগীর মতো, তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময় তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন 'বিরচিব মধুচক্র'। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভরছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি। তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্তী একলা মানুষে মিলে বাংলাসাহিত্যকে বিচিত্র করে গড়ে তুললো।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ, যিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যকে দলের বস্তু বলে মানতে চাননি তিনি কেন সাহিত্য সৃষ্টিতে লোকের মুখে চেয়ে থাকবেন। তিনি এও জানতেন সংসারের খ্যাতি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আজ যার স্বীকৃতি, কাল তার প্রত্যাখ্যান। আজ যিনি পরম আদরে সম্বর্ধিত, কাল তিনি পরম অবজ্ঞায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত। যাঁরা সাহিত্য রচনাকে হৃদয়ের বস্তু বলে মনে করেছেন তাঁরা জানেন যে বাস্তব সমস্যা সমাধানই সাহিত্যের প্রথম কর্তব্য নয়। রূপসৃষ্টি, তার থেকে রসসৃষ্টি যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তবে সংসারের লৌকিক সমস্যা সমাধানে তার কোন গরজ থাকার কথা নয়। একদল আধুনিক এ কথায় আপত্তি করতে পারেন। তাঁরা হয়তো বলবেন ইতিহাসের গতিনির্ণয়ে লেখকের অক্ষমতা তাঁর ব্যর্থতার পরিচায়ক। সমাজের সমস্যা সমাধান না হোক সে সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট মতামত থাকা চাই। এ সম্বন্ধে কমিউনিজমের অন্যতম নায়ক এঙ্গেলস বলছেন—

> **I think that the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications, and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured.**

তাই লোকপ্রিয় কোন সিদ্ধান্ত প্রচারের যে জনপ্রিয়তা, তা কালের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নেবে, কিন্তু আন্তরিক আদর্শের মধ্যে যার জন্ম সে বাঁচবে কালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে।

অবশেষে এই লোকস্তুতির সম্বন্ধে কবির মনোভাব আর এক তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ পেলো প্রান্তিক কাব্যে। লোকখ্যাতির প্রতি তাঁর অবিশ্বাস, তাঁর আন্তরিক বৈরাগ্য মৃত্যুর কঠিন স্পর্শ লাগার পর আর একবার শোনা গেল। মন যখন খ্যাতি-অখ্যাতির উর্ধ্বে একটি শান্ত রসস্নিগ্ধ পরিবেশ নিজের জন্য গড়ে নিয়েছে তখন বাইরের পৃথিবীর কল কোলাহল সবই অর্থহীন প্রলাপের মতো।

সাঙ্গ হল
ফুল ফোটাবার ঋতু, সেই সঙ্গে সাঙ্গ হয়ে যাক
লোকমুখবচনের নিঃশাস পবনে দোল খাওয়া।
পুরস্কার প্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে; (প্রান্তিক, ১২)

জনতার তালে তাল মিলিয়ে কাব্য রচনায় অনিচ্ছুক কবি নিজেকে বলছেন—

কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে-আসন
পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো কবি,
পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতাদেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। (প্রান্তিক, ১১)

যে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করলুম তার সত্যতা প্রমাণ করছে তাঁর জীবন। আমেরিকার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের বহু রীতির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করছেন, যে জাপানের জনাকীর্ণ বন্দরে বিপুল সম্বর্ধনার মধ্যে তিনি নামলেন সেই জাপানের জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করে ফিরে এলেন বন্ধুহীন বিদায় নিয়ে। ঘরে বাইরে চরকা নিয়ে সেদিন কত সমালোচনা। কিন্তু স্রষ্টা তিনি, কালের যথার্থ প্রতিনিধি তিনি, তাই বাইরের উত্তেজনাকে ভাষা না দিয়ে তার অন্তর্গূঢ় অভিপ্রায়কেই তিনি ভাষা দিয়েছেন। চাটুলুব্ধ জনতাদেবীকে অর্ঘ্য শেষ জীবনে কেন, কোনদিনই তিনি দেননি।

কিছুতে কেন যে মন লাগেনা

"দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।"

ঘন বর্ষার দিনে ঘরে বসে থাকি, আকাশে নিবিড় কালো মেঘ, মন উদাস হয়ে ওঠে ; ঠিক এমনি একটি আসন্নবর্ষণ মুহূর্তে সঙ্গলোভী মন ভাবছে কার কাছে যাই, এমন বন্ধু কে আছে যাকে নিয়ে এই ধারাপতনের সুরে মন ভরাবো। একে একে মনে পড়লো সকলকে, প্রিয় থেকে প্রিয়তর, কিন্তু মনে হলো ঠিক এই বর্ষার কান্নায় সাড়া দেবার মত কেউ নেই। যারা আছে সবাই, তাদের কাউকে নিয়েই এই শ্রাবণের সন্ধ্যা কাটবেনা।

কেন কাটবেনা, যাদের জানি, যারা নিবিড় বন্ধুত্ব দিয়ে এতকাল ভালবেসেছে তারা সবাই আজ আমার মনের স্বীকৃতি হারালো কি করে। তারা তো যেমন ছিল তেমনি আছে, এই বর্ষার পাগল-করা লগ্নটির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তো মনে হয়নি যে তারা আমার মন ভরে না আর। তাহলে এই বর্ষা কি মোহ নিয়ে এলো যাতে আমার মন নতুন সঙ্গীর সন্ধানে ব্যাকুল হলো। 'ঝরঝর মুখর বাদর দিনে, জানিনে জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগেনা'।

মন যে লাগেনা তার জন্যে দায়ী বন্ধুরাও নয়, বর্ষাও নয়। দায়ী মন নিজেই। মানুষের মনের গভীরে কি পাগলামির এলোমেলো হাওয়া বইছে, বাইরের সমস্ত হিসেব উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, কি সে চাইছে তা নিজেও ভাল করে জানছেনা, যা পেয়েছে তাতে মন যে কেন লাগেনা তাও সে

বুঝছেনা। মানুষের কাছে সবচেয়ে অপরিচিত তার নিজের মন। কত বিচিত্র কামনা, কত অজানা ইচ্ছা অকস্মাৎ অবচেতনের স্তর ভেদ করে মাথা তুলে নিজের চরিতার্থতা দাবি করছে মানুষ তার হিসেব পায় না। বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে বসে, মন কেমন করে চলে, মনের গতিপথ কোন-দিকে তার সাইকো অ্যানালিটিক্যাল হিসাব হয়। তবু বস্তুর মত মন ধরা দেয় না, বস্তুবিজ্ঞান বস্তুর নাগাল যেমন করে পায়, মনোবিজ্ঞান তেমন করে পায়না। মনের সব তত্ত্ব যেদিন বৈজ্ঞানিকের কাছে ধরা পড়ে যাবে সেদিন এই বর্ষা, এই চন্দ্রালোকস্নাত রাত্রি কি ব্যর্থ কি শূন্য হয়ে উঠবে। ভরসা এই যে মন ধরা দিচ্ছে না। বোঝবার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে মন আজও উন্মনা হচ্ছে, অকারণে চোখে ভরে আসছে জল, বর্ষার জোলো হাওয়ায় মনকে দিক ভুলিয়ে দিচ্ছে, যা অসম্ভব তার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে তবু সহজ কথা কেন জানি সহজে বুঝছে না।

অথচ সকলের মন তো এমন নয়। প্রতিদিনের বাঁধাধরা হিসাব নিকাশের মধ্যে মাথাগুঁজে চাপা দেওয়া মন নিয়ে দিন তো কাটায় কেউ কেউ। কত বর্ষার গান সাড়া না পেয়ে ফিরে যায়, কত শরতের সোনার আলো তাদের জগতে পড়লো না কোনদিন, "লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনা! মনটা যেন আরো শতলক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মাণিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!'

কিন্তু তাদের কথা তো নয়, মন যাদের আছে; যাদের মনে বাইরের জগত নানাভাবে ডাক পাঠায় তারা কি করে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সেই ছোট ছেলেটি দূর আকাশের নেশায় যার মন মাতাল, সে দেখেছে দিনের পর দিন প্রচণ্ড সূর্যালোকে পৃথিবী যখন ক্লান্ত অবসন্ন তখন আকাশের বুকে চিল বেড়ায় উড়ে, দূর থেকে ডাক দেয় ফেরীওলা।

> আরো দূরে দেখা যাইত, তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের

> শ্রেণী মধ্যাহ্ন রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত ; মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া, রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ওই অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই চুড়ি চাই, খেলেনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

এই শিশুচিত্তই বিস্তৃত প্রান্তরে বেড়ে উঠলো। মন তার ছুটে চলে গেল দূরদূরান্তে। পর্বত আকর্ষণ করলো, আহ্বান পাঠালো সিন্ধু, কঠিন আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরলো নদী, দেশবিদেশে ঘরে ঘরে ঘর পেলো সে। মন তার সীমা মানে নি, জাতের সীমা, দেশের সীমা, ধর্মের সীমা সব খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল—আত্মপ্রকাশ করলো একটি মানুষ—সকল জাতের, সকল দেশের, সকল ধর্মের একটি পরমাত্মীয় মানুষ।

এই যে মনের পরম রহস্যময় ব্যবহার,—কোন কিছুতে খুসী না হওয়া, পরম অতৃপ্তি দ্বারা তাড়িত হওয়া এরই মধ্যে মানুষের পরিচয় লুকিয়ে আছে। মানুষ বলেই সে তৃপ্ত নয়, তৃপ্ত হতো পশু হলে। সে তার চাওয়ার দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে—এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। তারপর যত চলে দেখে তার দিগন্ত তখনো দূরে, যেমন ছিল আগে। তখন দিগন্তের মোহ ভুলে পথের প্রেমে মাতে, বলে 'পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।'

এই ভোলা মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন—কত পথ কত শোক তাপ, কত আনন্দ উজ্জ্বল দিনের ওঠা নামা পার হয়ে। মন কিছুতেই ভরেনি। দুচোখ মেলে এ সংসাকে দেখা, কত প্রীতি, কত বন্ধুত্বের বাঁধন, জীবনের পাত্রে কত সুধার সঞ্চয় তবু মনে হলো যে অঞ্জলি পূর্ণ হয়নি। তৃপ্তি আর অতৃপ্তি পাশাপাশি চলেছে জীবনে। এই মুহূর্তে মনে হলো জীবন পূর্ণ, পরমুহূর্তে মনে হলো 'বেসুর বাজে রে।' কোথায় বেসুর, বাইরে নয়, প্রভাতের আনন্দিত আলোয় নয়, 'কেবল তোরি আপন মাঝে রে।'

একটি কাজে এই মনের মুক্তি আছে। সে হলো 'অকারণ অবারণ চলা।' উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন পথ পার হয়ে হয়ে চিরনতুনের সন্ধানী মন তৃপ্তি খোঁজে। সে জানে যা পেয়েছি তা নয়, না-পাওয়ার রাজ্যে স্বপ্ন ছড়ানো আছে। তাই দূর দিগন্তের ডাক নানা আভাসে ইঙ্গিতে মনকে নাড়া দেয়। মন চলে দূরের নেশায়, বাউল কবি গান বেঁধেছে—পথের প্রেমে পাগল করা সুর সেই গানে। রবীন্দ্রনাথের জীবন সেই উধাও পথিকের জীবন। বলাকা গতির কাব্য—অনেকের মনে এ ধারণা আছে যে চলার সুর বুঝি বলাকাতেই প্রথম বাজলো। ঐ হংসবলাকার দল কবির মনে চলার রাগিনীকে ধরিয়ে দিলে। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সমস্ত চেতন অচেতন জগৎ জুড়ে চলার কথা এমন করে বাজেনি তা ঠিক, কিন্তু এর আগেও শুধু চলার আনন্দেই চলার গান তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। জীবনস্মৃতির পাতায় পাতায় সাক্ষ্য আছে দূর কেমন করে ডেকেছিল, বিশ্বপ্রকৃতি কেমন করে ঘরোয়া বাঁধন ছিঁড়েছে একে একে। কবিতায় গানে একথা এত ছড়ানো যে উদ্ধৃতি নির্বাচন কঠিন। শ্রীমতীকে ডেকেছিল বাঁশীতে, ঘর ছেড়ে সে ছুটেছে নদীর কূলে। কবিকে ডাকলো কে, কার ডাকে কবির ঘরে থাকা দায়ঃ

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

এ সুর রোমান্টিক কবিতার, অনুভূতি এক অধরা রহস্যের ডাকে পথে যাবার ভাবনায় সচকিত। এ যেন অতি স্নেহে, নিবিড় মাধুর্যে, ভালবাসার

আহ্বান। আবার এরই পাশে এই পথচলার ইচ্ছা কত প্রবল কত দুর্দম হয়েছে; তার সংকোচের বাঁধন গেছে কেটে, পথের বিপদ তার আশংকার কারণ নয় আর।

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি······
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি।

পথ চলতে চলতে যদি আলো নেভে, পুরানো পথের দিক যদি ভুলে যাই, কবির মন তাতে সন্ত্রস্ত নয়। তার সান্ত্বনা আছে 'বুঝিবা এই বজ্ররবে নতুন পথের বার্তা কবে।' এই পথ নিয়ে কবির মন নানা ভাবের দোলায় দোলে। কারণ কোন লক্ষ্য নেই যেখানে পৌঁছে পথ বলবে, এসেছি—সব সার্থকতার শেষ তীর্থে এসেছি। তখন আবার জাগবে কান্না, আবার মন বলবে 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে।' অন্য যে কোন লক্ষ্যের রসই ফুরাবে। কেবল পথে চলার রসকেই কবি বললেন নিত্যরস।

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি······
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।

আবার এই পথ চলার মধ্যেই ঐ কিছু-ভাল-না-লাগা মন তার অধ্যাত্ম বাসনাকেও পথের সুরে বেঁধে নেয়। তখন মঠমন্দির মসজিদ সব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, পুণ্যবাসনা মিলিয়ে যায় ভোরের বাতাসে, বদ্ধ সংকীর্ণ জলার মত যে জীবন স্তিমিত সে চলার পথ পেলে বেঁচে ওঠে:

যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।

এই পথ চলতে চলতে প্রণাম জানান পথের সাথিকে, নিজেকে বলেন 'নিত্যপথের পথী।' ঘরে যে মন রয়না তাকেই যেন খুঁজে ফেরেন পথে। গীতালি-গীতিমাল্য-গীতাঞ্জলির যুগে এমনি আরও বহু গান আছে। যে

মন বর্ষার দিনে ঘরে বসে ভাবে 'কিছুতে কেন যে মন লাগেনা' সে মন শেষ পর্যন্ত পথেই নেমে পড়ে, ঘোরে অকারণে, সেই ঘোরাতেই তার অজানা আনন্দ।

গীতাঞ্জলির যুগের কিছু পরে এলো কবির পশ্চিম যাত্রার একটা পালা। কেন যাওয়া; কি দেবে পশ্চিম। এই মহান আধ্যাত্মিকতার সম্পদ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে ইউরোপ কি দেবে। হিসেবী বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভেবে পায়না। কিছু পাবার স্পষ্ট বাসনা না থাকলেও যে যাওয়া যায় ঘরবাঁধা মন তা বুঝে উঠতে পারে না। যে মন ঘরে তৃপ্ত নয়, যে মন দূরদিগন্তের বিস্তৃতিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচতে চায় তারই কথা কবি বললেন তাঁর কৈফিয়তে:

> বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ, একথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।...... কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুইটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

এরও কিছুকাল পরে এলো বলাকার যুগ। যেখানে কবি দেখেছেন সংসার চলেছে, মানুষ, নদী, মাটি সব চলেছে। শুধু চলেছে নয় চলার নেশা জাগিয়ে জাগিয়ে চলেছে। হংস বলাকার পাখার ডাকে 'পর্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', তরুশ্রেণী পাখা নিয়ে উড়তে চায়। দেখা গেল সমস্ত পৃথিবীর কেউ কোথাও যা আছে তা নিয়ে খুসী নয়—কিছুতেই তাদের মন লাগেনা কেবলই বলে 'হেথা নয় হেথা নয় আর কোনখানে।'

হে হংসবলাকা

আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

এই গতি নিয়ে চলছে নদী, চলছে প্রেমিক সাজাহান। মন তাদের ভরলো তাই তো আজও ছুটছে। মনে পড়ছে সেই পথিকদের কোন্ দূরকাল থেকে যারা যাত্রা স্বরু করেছে, যারা আজও চলেছে, অতৃপ্ত অন্তরে যারা চিরকালের না-পাওয়ার জন্য ঘুরে মরছে। তাদের কথা কবির কথায় আজ স্থর মেলালো—

অতীতের গৃহ ছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়-তীরে-তীরে।

এই পথ ভোলা মন নিয়ে আর দুটি বালক রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে—একজন ডাকঘরের অমল আর একজন অতিথি গল্পের তারাপদ। যে মন নিজের অবস্থায় খুসী নয়, যে ভাবে তার বাইরে দূর পৃথিবীতে নানা স্বপ্ন লুকিয়ে আছে, সে উদাস হয়ে ঘর ছাড়ে, বাঁধন ছেঁড়ে। এই দুটি বালকেরও সেই অবস্থা। কে জানে হয়তো বালক রবীন্দ্রনাথের সেই ছাদে কাটানো দুপুর এদেরই মধ্যে বেঁচে উঠেছে। অমল তাই চেয়েছে বেড়াতে, শুধু বেড়াতে। দূর পাহাড় পার হয়ে কর্মহীন মধ্যাহ্নে, নীল আকাশের হাত তুলে ডাকার মধ্যে সে পৃথিবীর কথা শুনতে পাচ্ছে।

আর কল্পনায় ছবি আঁকছে যে সে এক খেপাকে দেখেছে, যে খেপার লাঠির আগায় পুঁটুলি বাঁধা, বাঁ হাতে ঘটি, পায়ে একজোড়া নাগরা।

> আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন যাচ্ছ। সে বললে কাজ খুঁজতে যাচ্ছি।...... আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুরগাছের তলা দিয়ে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরণার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে—তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে—পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরণার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ওই ঝরণার ধারে গিয়ে একদিন ছাতু খাব।

এই অমলের দূরে-ছুটে-যাওয়া মন ঐ রোমান্টিক মনেরই প্রকাশ। রোমান্টিসিজমের ধর্মই হলো, দূরের জন্য আকুতি। কাছের বস্তুতে ভরেনি মন, তাই দূরে, যা অজানা তার মধ্যে মন ছুটে যেতে চায়। অমল সেই মনের কবি। তেমনি তারাপদ। সংসার যখন স্নেহবন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে তখন বাইরের মুক্তি তাকে নানারূপে টেনেছে—

> সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে।

এমনই অবস্থায় তারাপদ চলে গেল। এই ছবি দিয়েই এই প্রবন্ধ সুরু করেছিলাম। সমস্যাও সেই রয়ে গেল, তারাপদর মন কেমন করলো, যা হতে চলেছে তাতে প্রাণ ভরলো না। উদাসী মন বর্ষার মেঘান্ধকারে কোন্ দূরে পালালো, কে জানে।

পশ্চিমদিগন্ত পারে

পশ্চিমের হাওয়া যেদিন পূর্বের তটে এসে লাগলো সেদিন আমাদের ইতিহাসে এক নতুন যাত্রা পথ খুলে গেল। দূরদূরান্তে বাধা ঘুচলো, ঘুমঘুম চোখে হঠাৎ এসে লাগলো তীব্র আলো। সেই প্রভাতে কয়েকজন পুরুষ ছিলেন যাঁরা ঐ আলোয় নিজেদের সত্যকে আর একবার যাচিয়ে নিতে চাইলেন। দেশের গণ্ডী যে সত্যকে সীমা দিতে পারে না একথা তাঁরা জানতেন, তাই এই বহিরাগত আলোর বিভায় নিজেদের মনের দিগন্ত রঙ্গিয়ে নিতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিজ্ঞান চর্চাকে আমাদের শিক্ষা করে তুলতে রামমোহনের ছিল ব্যগ্রতা, বিদ্যাসাগর সেই শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য অসীম আগ্রহ নিয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কি পেয়েছিলেন তাঁরা ঐ পাশ্চাত্যশিক্ষার ধারায় যা ভারতবর্ষ দিতে পারে নি। এ শিক্ষা কি এতই প্রয়োজনীয় ছিল। রামমোহন কলকাতার সহরে সংস্কৃত স্কুল স্থাপনার কথা শুনে লিখেছিলেন যে, ঐ স্কুলে ছেলেরা কি শিখবে ?—দুহাজার বছর আগেকার ব্যাকরণ আর তার নানা টীকার নিপুণ চুলচেরা বিশ্লেষণ, যার সঙ্গে আজকের সমাজের কোনই যোগ নেই। সেই চিঠি রামমোহন তৎকালীন বড়লাট আমহার্স্টকে লিখেছিলেন ! তাতে তিনি অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে বলেছিলেন, কি হবে বেদান্ত পড়িয়ে ? তরুণ যুবকদের মনে একথা ঢুকিয়ে লাভ কি যে সংসারটা সবই মায়া, বাপ, মা, ভাই, বোন সবই আসলে অস্তিত্বহীন, যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারি এই মায়া এড়িয়ে ততই ভাল। মীমাংসা পড়েই বা কি হবে, শাস্ত্রের কোন স্তোত্র পড়ে ছাগহত্যার পাপ থেকে মুক্তি হবে একথা জেনেই বা কি লাভ ? তিনি স্পষ্ট বল্লেন যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমরা বিজ্ঞান

শিক্ষা চাই। তিনি বলছেন আমরা এই সব বিজ্ঞানের পাঠগ্রহণ করতে চাই—Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection. পাশ্চাত্যের অহংকৃত, উদ্ধত, গর্বিত রূপের অন্তরালে তাদের শক্তির আসল উৎসটিকে রামমোহন দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন তত্ত্ব পুনরাবৃত্তির দিন চলে গেছে, বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা তিনি তো আচ্ছন্ন হন নি। তিনিই তো আবার পুরাণো শাস্ত্র উদ্ধার করে শাস্ত্রচর্চার পথ আর একবার খুলে দিলেন। তবু পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করেন নি। রামমোহনেব এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ—

> তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়বো, এই ছিল তাঁদের ভয়। একথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্যার দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয়সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে যে যুক্তিবাদের ধারাটিকে রামমোহন অন্তরে গ্রহণ করতে চাইলেন তার যথার্থ তাৎপর্য তখন কেউ কি বুঝেছিলেন ; এ তো এমন কাজ নয় যার একটা প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে বরং মনে হয়েছে মানুষের দেশীয় শিক্ষার পথকে অবহেলা করে বিদেশীর প্রতি রামমোহনের মন ঝুঁকেছে। কিন্তু লোকবচনের অনেক উর্ধ্বে ছিল এই জাগ্রত প্রাণের বিচরণক্ষেত্র। তিনি জানতেন যুক্তির চর্চা একবার সুরু হলে অবিদ্যা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে।

বিদ্যাসাগর দেশকে ভালবাসতেন না এমন কথা কে বলবে। কিন্তু তাঁর জীবনেও দেখেছি সেই ভালবাসা তাঁকে বুদ্ধিহীন ভাববাদের পথে ঠেলে দেয় নি। প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও শাস্ত্র তাঁর তো অজানা ছিল না। কিন্তু

যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখনই তিনি বলছেন সংস্কৃতে অঙ্ক করা চলবে না, ইংরাজিতে করতে হবে; মিলের লজিক পড়াতেই হবে, আর পাশ্চাত্য দর্শনের গভীরতার দ্বারা সাংখ্য আর বেদান্তের ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করতে হবে। তাঁর রিপোর্ট থেকেই পাচ্ছি—

> Under the present state of things the study of Mills work in the Sanskrit College is, I am of opinion indispensable. .....
>
> That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindoos. Whilst teaching these in the sanskrit course, we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence.

ভারতবর্ষীয় মন প্রাচীন বিধানের বন্ধনে কেমন করে বাঁধা পড়েছিল আর তার ফলে যাবতীয় নূতন কথাকে কেমন অবজ্ঞাভরে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, সে অন্ধতার রূপ যে কি ভীষণ তা বিদ্যাসাগর নির্মম ভাষায় বলে গেছেন। যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষার কথা রামমোহন রায় তাঁর আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে বলেছেন সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যাপক করে তুলতে গিয়ে কি প্রচণ্ড বাধা তিনি পেয়েছিলেন তার প্রমান কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারীকে লেখা তাঁর ১৮৫৩ সালের চিঠি। উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হবে তবু বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার আশ্চর্য পরিচয় এরই মধ্যে পাওয়া যাবে, আর মনে রাখতে হবে এই রচনা সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের :—

> It is not possible in all cases I fear that we shall be able to shew real agreement between the two, it appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakeable. Any idea

when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths the germs of which their shastras contain they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to this old prejudices....They believe that their shastras have all emanated from omniscient Rishis and therefore they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European Science is presented before them, they laugh and ridicule.

এই অবস্থার মধ্যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সত্যকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়ার সাহস তাঁর ছিল। তাঁর পরিচয়ে দয়া, সাহস, চরিত্রবলের কথাটা তাঁর জীবনী-গুলিতে যতটা ফুটেছে তাঁর মননশীলতার কথাটা ততটা ফোটেনি। কারণ মননশীলতাকে একটা বিশেষ গুণ বলে একালের বাঙ্গালী ভাবেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের এই অতি উজ্জ্বল অংশটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনিই প্রথম বল্লেন—

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ মননজীবনই তাঁহার মুখ্য জীবন ছিল।···

তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের জীবনধারার মধ্যে এই যে একটা প্রবল যুক্তিবাদী চেতনা কাজ করছে তার যথার্থ তাৎপর্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অনেক নেতার কাছেও স্পষ্ট হয়নি। দেশাত্মবোধের উগ্র অভিমানে তাঁরা পাশ্চাত্য

সভ্যতাকে শুধু বস্তু-সভ্যতা বলে নিন্দা করেছেন, সে সভ্যতাকে মেটিরিয়াল প্রস্পারিটি বলে, টাকা-দেবতার সভ্যতা বলে ধিক্কার দিয়েছেন। সে সভ্যতার যে একটা প্রাণশক্তি আছে আর তা যে কতকগুলি মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে একথা তাঁরা মানতে চাননি। একথা ঠিক বাইরে থেকে দেখলে অর্থের বিনিময়ে মানুষের-হিসাব-কষা এই সভ্যতার বীভৎস রূপটাই বড়। কিন্তু সে তো য়ুরোপীয় সভ্যতার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নয়। সে হলো বণিকতন্ত্রী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, যা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগ মাত্র। আজকের ভারতবর্ষে সেই সভ্যতা এসেছে, একটু দেরীতেই এসেছে। এই ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে যারা দেখবে তারা এর আধ্যাত্মিকতা কোথায় খুঁজে পাবে। কলকারখানা, সহর, বাঁধ বেড়ে উঠেছে, দেশ জুড়ে মজুরের দল নগদমূল্যে শ্রম বিক্রয় করছে। একথা বলতেই হবে এই প্রচণ্ড যন্ত্রধারী সভ্যতার অন্তরে মানুষের লোভ, হিংসা, স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বিবেচনা ও উদার দাক্ষিণ্য কাজ করে চলেছে তা অনেকে বোঝেননি। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরঙ্গ সমালোচনায় তাঁদের দৃষ্টি সীমায়িত হয়ে গেল। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের গৌরব কাহিনী যতই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হতে লাগলো ততই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকলো মনের মধ্যে আর পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতা-শূন্য জড়বাদী সভ্যতা বলে গাল দিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রবল হতে লাগলো।

পাশ্চাত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বরাবর এক ছিল না। প্রথম তিনি যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন—ইংলণ্ডবাসীরা অনুক্ষণ বিদ্যানুশীলনে রত, দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কেবলি টেনিসনের বীণা বাজছে, গ্লাডস্টোনের বক্তৃতা, ম্যাক্স-মুলরের বেদব্যাখ্যা, টিনড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইল আর বেনের গভীর রচনাগুলি নিয়ে আবালবৃদ্ধ বণিতা ইনটেলেকচুয়াল আমোদে মগ্ন। বলা বাহুল্য এ ধরনের কবি কল্পনা নিয়ে গেলে তাতে আঘাত না লাগাটাই অস্বাভাবিক। অত্যন্ত ভালোকে আশা করা গিয়েছিল, পাওয়া গেল না। যুবক রবীন্দ্রনাথের এই আশাভঙ্গের বেদনা তাঁর মনের ভারসাম্য নষ্ট

করে দিল। অতি ভালোর পরিবর্তে যা দেখলেন তাকে কোনমতেই অতি মন্দর কম কিছু বলা যায় না। মেয়েমহলে শুধু কন্সর্ট, থিয়েটার প্রভৃতির আলোচনা 'মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক অনাবশ্যক-মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে।' এছাড়া চোখে পড়ল সারি সারি মদের দোকান, জুতো, দর্জি, মাংস, খেলনার দোকান কিন্তু চোখে পড়লোনা বইয়ের দোকান। খবরের কাগজ থেকে টুকরো খবর পড়ে মানবচরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা তৈরি করতে লাগলেন কোথায় কোন্ বালকের নিষ্করুণ নৃশংসতার কাহিনী বেরিয়েছে তা থেকে ধারণা হলো ঐ দেশের নিম্নস্তরের মানুষেরা 'যেন পশু থেকে এক ধাপ উঁচু।'

এই সব ধারণাকে কবি পরবর্তীকালে মোটামুটিভাবে অস্বীকার করেছেন যদিও বলেছেন, 'ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।' বাইরে থেকে যে কোন সমাজেরই অজস্র ত্রুটি দেখানো যাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পাশ্চাত্য সমালোচকদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সমালোচনাকে অপরিচয় ও অপরিণত বুদ্ধির ফল বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচয়েই পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণাগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গড়ে উঠেছে। ফলে শুধু বহিরঙ্গ অসতর্ক সমালোচনার যা ত্রুটি সবই তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।

দশ বছর পরে আবার চলেছেন য়ুরোপ। এবারে ঐ ছোটখাটো লৌকিক আচরণ দেখে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশের ছেলেমানুষী আর নেই। কবির দৃষ্টি আরও অন্তর্ভেদী হয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও প্রাচ্যসভ্যতার তুলনা করেছেন। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড গতিবেগের পাশে আমাদের শান্ত, ঘুমন্ত, ছুৎমার্গী জীবনকে তিনি 'আধ্যাত্মিক বিলাসিতা' নাম দিয়ে তার চরিত্র নির্দেশ করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টি সংশয়াকুল। ওদেশের স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্তির লড়াইকে সমাজের সামঞ্জস্য-

নাশের ফল বলেই তাঁর মনে হয়েছে। নারীহৃদয়ের যে চরিতার্থতা প্রাচ্যসমাজে সম্ভব তা 'ইংরাজ পরিবারে অসম্ভব' বলে মনে হয়েছে। প্রচলিত একটি ধারণার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলে কবি বলছেন, 'যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনি প্রভু হয়ে বসে যে তার হাত আর সহজে এড়াবার যো থাকে না।···বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেইরকম প্রবল নদী বলে এক একবার মনে হয়। তার বেগের বলে মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।···যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয় তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে।' বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কবি তখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বনাশের দিকটি দেখেছেন কিন্তু প্রাণের উৎস তখনো চোখে পড়েনি। অভাবাত্মক রূপ এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে যে ভাবের দিকটা চোখে পড়লো না। কিন্তু তবুও এই বিচারের মাত্রাহীনতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের কাছে যে অঞ্জলি ভরে নিতে হবে সেকথা কবি তখনই বলেছেন। ইংরাজি শিক্ষা নিলেই কি ইংরেজ হয়ে যাব। এই আশঙ্কা দূর করে রবীন্দ্রনাথ তখনই বলছেন, "আমাদের বহুকালের রুদ্ধবাতায়নগুলি খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্বপশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারবো। যে-সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিম্বা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে।" এর চেয়ে বড় কথা হলো যে তিনি এমন একটি মূল তত্ত্বে পৌঁচেছেন যেখানে ভাল-মন্দের বিচার আর দেশানুসারী নয়। ভাল যে সব দেশেই থাকে এবং মানবকল্যাণের জন্য তার যে সার্বজনীন রূপ কবি তা এবারে বুঝেছেন। তিনি বলছেন, 'কেহ কেহ বলেন য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোন প্রকৃত ভালো কখনোই পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, তারা অনুযোগী।'

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও য়ুরোপীয় জীবনের আর একটা দিকের প্রশ্ন কবির মনে রয়েই গেল। তাদের দ্রুতগতি জীবন, তাদের নিত্যব্যস্ততা, অবিশ্রাম কর্মোন্মত্ততা আর অশান্ত জীবনসংগ্রাম কবির কিছুতেই ভাল লাগেনা। এর যে একটা গভীরতার দিক থাকতে পারে তা মনে হচ্ছেনা; উপরন্তু কবির এখনও মনে হচ্ছে এই বিরাট ধাবমান য়ুরোপের অতীত যেন বলছে, 'একটু রোসো, একটু থামো—এসব কি হচ্ছে একটু ভাবো, একটু ভাবতে সময় দাও।' তিনি অবশ্য এই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে ভারতীয় শান্তিকেও বড় বেশি শান্তি বলে উল্লেখ করছেন তবু এই কাজের পাগলামীর কোন সমর্থন পাচ্ছেন না।

১৯১১ সালে তিনি আবার চলেছেন য়ুরোপ। এই যাত্রার আগে আশ্রমে য়ুরোপ যাবার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। য়ুরোপ সম্বন্ধে দৃষ্টি প্রায় আমূল পরিবর্তিত। ঐ গতিশীল, বাহ্যবস্তু ভিত্তিক, চাকচিক্যময় সভ্যতার বাইরের রূপের ভিতরে আর একটা শক্তি রয়েছে যেটাকে তিনি অসংকোচে আধ্যাত্মিক শক্তি বলেছেন। সংস্কার মুক্ত হয়ে যদি দেখি, যদি স্বাদেশিকতার অহংকারে উন্মত্ত না হই তাহলে বুঝতে কষ্ট হয় না এত বড় একটা সভ্যতা শুধু বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় গড়ে ওঠেনি। লোকমুখে এ প্রচার তখন বেশ ছড়িয়ে গেছে যে আধ্যাত্মিকতাহীন য়ুরোপীয় সভ্যতার অন্তরে কোন বিশ্বাসের শক্তি নেই সে শুধু ভোগোন্মত্ত। রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে এ ধারণা যে প্রথমে স্থান পেয়েছিল তা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' দেখেছি। য়ুরোপীয় চিত্তের বিরাট ব্যাপ্তি আর নানা বিষয়ের প্রবল ঔৎসুক্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। য়ুরোপের বহিরঙ্গ বিচারে যে তার সম্বন্ধে শেষ কথা নয় এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রার পূর্বপত্রে' বললেন, আর বললেন য়ুরোপ যাত্রা তাঁর পক্ষে তীর্থযাত্রা। যাঁরা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে অবহেলার সঙ্গে অস্বীকার করতে চান। তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপে জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হবার প্রয়োজন থাকে না।" এই অন্ধ ধারণার যুক্তি একটি, তা হলো বহুকণ্ঠে তার আবৃত্তি। উনবিংশ শতকের বাংলার

অনেক উল্লেখযোগ্য নেতাও এই কথা বার বার বলেছেন। তাঁদের মনেও এ প্রশ্ন আসেনি যে যে শক্তির বলে পাশ্চাত্য আজ এত' প্রবল সে কি শুধুই কলকারখানার শক্তি। মানুষের মন কি শুধুই কলের পিছনে পিছনে চলছে? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপের একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, সে আত্মা দুর্বল নহে।" য়ুরোপকে শ্রদ্ধা করবার আর একটা কারণ কবির জীবনে ঘটেছে। এমন য়ুরোপীয় তিনি দেখেছেন যারা বস্তু সভ্যতার চেয়ে বড়, যারা তার ভিতরকার প্রাণ। তিনি দেখেছেন রামমোহনের জীবনীপাঠে উদ্বুদ্ধ হ্যামারগ্রেণকে, দেখেছেন বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় জাগ্রত নিবেদিতাকে। তারপরেও তিনি কেমন করে বলবেন য়ুরোপের আত্মা নেই। কবি বলছেন, "য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে। ভারতবর্ষে আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ যে য়ুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের দুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই ধুলায় তাহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই; জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।

"য়ুরোপেও যে কোন সত্যের আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জ্বল। এই জন্যই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়তো আরও কঠিন। বীর প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত, মণিমুক্তার ঝালরের দ্বারা খচিত, সেই পর্দাটাকেই সেখানকার সকলের চেয়ে মুল্যবান পদার্থ মনে করিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি— তাহার পিছনে যে দেবতা বসিয়া আছেন তাঁহাকে হয়তো প্রণাম করিয়া ভালবাসা ঘটিয়া উঠে না।"

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় আত্মত্যাগের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলেন। পাশাপাশি দেখালেন আমাদের তথাকথিত সন্তোষ আমাদের কি নিশ্চেষ্ট জড়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। নানা কাজে প্রতিদিন য়ুরোপের

মানুষ বিপদের দিকে ছুটে চলেছে, মাথা পেতে নিচ্ছে দুঃখকে। তার পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদ যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি তাগিদ জ্ঞানার্জনের, প্রেমের, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগের ও মানবকল্যাণের। এই আত্মত্যাগই যে আধ্যাত্মিকতার একটা প্রকাশ, এও যে এক প্রবল ধর্মবুদ্ধি, এও যে আত্মার শক্তি একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বুঝেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন।

বহু য়ুরোপীয় মানুষ নিমজ্জমান টাইটানিক জাহাজে শিশু ও নারীকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন। নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টামাত্র তাঁরা করেন নি। স্বার্থ প্ররোচনার চেয়ে বড় প্রবৃত্তি তাঁদের মধ্যে তখন জাগ্রত হয়ে উঠলো। কোন আদেশ নয়, কোন শাস্ত্রবচন নয়, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে এই মৃত্যু বরণ কি কোন জড়বস্তুর দাসের পক্ষে সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয় সম্পত্তির মতোই জানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে, যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই দুঃখ সেই মৃত্যুকে কি কখনো বস্তু উপাসক গ্রহণ করিতে পারে।" সুতরাং এবারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট যে য়ুরোপের উন্নতি বস্তুবলে নয়, ধর্মবলে যা-তার ভিতরকার শক্তি।

ইতিপূর্বে য়ুরোপের নানা সৎগুণ লক্ষ্য করেও কবি সে সভ্যতার আন্তর শক্তিকে খুঁজে পান নি। ভিতরের অভাবাত্মক দিকটাই বড় বলে মনে হয়েছে। এবারে অভাবাত্মক চেহারার ভিতরের ভাবাত্মক রূপটি চোখে পড়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির আক্রমণের সামনে ইউরোপ উদাসীন হয়ে বসে নেই। সেখানে জীবনকে রক্ষা করার জন্য বীরের মত তার যুদ্ধ চলেছে। অদৃষ্টকে জয় করবার চেষ্টা তার প্রবল প্রাণশক্তির এক দুর্জয় প্রকাশ। য়ুরোপ যে দুর্বল জাতিগুলির উপর অত্যাচার না করছে তা নয়, কিন্তু সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ ঐ য়ুরোপ থেকেই জেগে উঠছে। যাঁরা য়ুরোপের মানবত্বের দর্শনকে তার লুব্ধ পিপাসা থেকে রক্ষা করেছেন তাঁরাই তার যথার্থ গুরু। রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা তাই, "সেখানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের

অন্তরতম দিব্যশক্তি।...য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে রেলে, টেলিগ্রাফে, কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এই জন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে, বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে ; এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না।"

এইবার যখন য়ুরোপে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সহযাত্রীদের প্রতি আরও গভীর ভাবে পড়েছে। এবার শুধু খাওয়া আর চালচলনের প্রতি লঘু মন্তব্য করে কবি খুসী নন। য়ুরোপীয় মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা কত নির্ভরযোগ্য তা বুঝলেন সহযাত্রীদের নিশ্চিন্ততা দেখে। স্বজাতীয় লোকেদের হাতে জাহাজের ভার ছেড়ে দিয়ে এরা প্রসন্নচিত্ত, কারণ, 'ইহারা নিশ্চয় জানে যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করিবার তাহা করা হইবে, সেজন্য ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণ সংশয়-সংকট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্যম ও নিরলস সতর্কতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।' এখন শুধু তাদের ধাবমানতা, তাদের ব্যস্ততাই চোড়ে পড়লো না, এখন দেখলেন তাদের কর্মে নিষ্ঠা, তাদের গভীর দায়িত্ববোধ, তাদের কঠিন কর্তব্যবুদ্ধি!

রবীন্দ্রনাথের মতামত আরও বদলে গেল। যে ছটফটানি আর মাতামাতি তাঁর কাছে প্রথমে নিতান্ত অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছিল, এবারে আর তাও হলো না। শক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস আম্রমুকুলের মতো হয়তো তদনুপাতে ফলদান করে না, কিন্তু মুকুলের অনাবশ্যক ঐশ্বর্য না থাকলে ফলের বেলায় কৃপণতা ঘটতে পারে। কবি বলছেন, 'যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উদ্যম নিতান্তই স্বভাবসঙ্গত, তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই।... শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মত অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।' কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে শক্তি যতই উদ্দাম হোক, প্রচুর হোক তাকেও একটা নিয়ম মানতে হয়, সেখানে তার শ্রী। জাহাজে

ইউরোপীয়দের মধ্যে একদিকে অক্লান্ত দৌড়ঝাঁপ অন্যদিকে নিয়মের প্রতি সরল আনুগত্য য়ুরোপীয় চরিত্রের সঙ্গতি প্রমাণ করছে।

যন্ত্রসভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কোন মমতা ছিলনা সে কথা রবীন্দ্রপাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। য়ুরোপকে যে কলের রাজ্য বলে মনে হয়, তার মানুষগুলো যে সেই কলের ফাঁকে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে সেটা যথার্থ নয়; এমনটা দেখি আমাদের দৃষ্টির দোষেই। মানুষকে তো কলের মত সহজে দেখা যায় না। তাকে আবিষ্কার করতে হয়—সেই আবিষ্কারের কাজে আমরা যারা স্বভাব-অলস তারা অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন তাদের রাজনীতির জগতে প্রশান্ত চিন্তার প্রাধান্য, মতামতের অনৈক্যেও সিদ্ধান্ত সুদূর পরাহত নয়। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ভালবাসবার, চিন্তা করবার কি তীব্র ক্ষমতা। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন তাঁদের মন কত সজীব। বাইরের জগতে যেমন ব্যস্ততা, তাঁদের মনোজগতেও তেমনি ব্যস্ততা। তাঁদের চিন্তার তীক্ষ্ণতার পাশে পাশে একটি মানবদরদী মন স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করছে। জাতির ভিতরে ভিতরে ভাবুকতা কত গভীর সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "ইঁহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে; তাহার চাকা আপনিই সরে। মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজন্য ইঁহাদের কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই সুচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায় এবং সেই ধারা দ্রুতগতিশীল।"

এমনি করে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ করেছেন ঐ সময়ে রচিত কতকগুলি প্রবন্ধে, সেগুলি 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁর এই সময়কার ধারণা এই সত্যে কেন্দ্রীভূত হলো যে য়ুরোপকে বস্তু সভ্যতা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না তার অন্তরালে মন আছে, ধর্ম আছে, চরিত্র আছে, আত্মিক শক্তি আছে।

য়ুরোপের যে চিত্ত শক্তি, তার যে বিচারবুদ্ধি, তার ছোঁওয়া বাংলা দেশকে জাগিয়েছে। যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কথা বলছি তার বীজও য়ুরোপীয় দর্শন থেকেই পাওয়া। 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের সেই

মননশীলতার শক্তিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। য়ুরোপ যে বিশ্বজয় করছে সে তার সত্যসন্ধানের সততায়।' বিজ্ঞান সাধনার যা প্রথম শিক্ষা তা য়ুরোপ পেয়েছে; 'বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাত প্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অণুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি।' আমরা চাই বা না-চাই আমাদের সাহিত্যে ইংরাজের প্রভাব পড়েছে। সে প্রভাব শুধু বাইরে থেকে রীতি ও ভঙ্গিতেই সীমাবদ্ধ নয় তা ভাববস্তুকেও প্রভাবিত করেছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর সেই প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখতে চাননি। তাঁরা দেখেছিলেন য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের আন্তর শক্তিকে, অন্যদেশের শক্তিকে আহ্বান না করার মত অল্পবীর্য ছিলেন না তাঁরা। আমাদের ভাবলোকে য়ুরোপের প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্ব-প্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর একদিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোন শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোন চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।" ঐ প্রবন্ধেই বলছেন "জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে।"

আমাদের জীবনে নানা ধরনের লৌকিক আচার বিচারের অজস্র বন্ধনের অন্ধতায় আমরা চিন্তা করাকে, তর্ক করাকে, প্রশ্ন তোলাকে প্রায় ঔদ্ধত্যের পর্যায়েই গণনা করি। বিশ্বের সর্বত্র যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের রাজত্ব চলছে, সেই নিয়মগুলি আয়ত্ত করাতেই যে বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান, যার প্রয়োগে জীবনের ছবি বদলে যেতে পারে—সে সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য নেই। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা মননের একটি আলোকিত রূপ তিনি বারবার তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, "য়ুরোপের সত্য সাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে, ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোন খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন।" অনুসন্ধিৎসু য়ুরোপের যে বিচার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অন্ধবিশ্বাসের উপর যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করছে তার

প্রতি চরম শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেছেন, "যদিও আমাদের চারিদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ ;···এইটে দেখিয়েছে যে জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও কোন ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।'

কিন্তু এই য়ুরোপকেই রবীন্দ্রনাথ শুধু দেখেন নি। তিনি দেখেছিলেন সেই য়ুরোপকেও যে য়ুরোপ অনাত্মীয় মণ্ডলে মশাল নিয়ে যায় আগুন লাগাতে। চীনের উপর, পারস্যের উপর, তার নির্মম ব্যবহার য়ুরোপের আর এক রূপ। যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপীয় বর্বরতা কবিকে হতাশ করে দেয়। য়ুরোপের পরে বিশ্বাস ছিল; জীবনের শেষ দশকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপীল পৌঁছাবে আজ।' কিন্তু শুধু বাইরের জগতে লুটপাট করেই য়ুরোপের মুক্তি নেই। লুটপাটের শেষ সরিক জার্মানি এলো বিলম্বে। তখন যে প্রভুদাস নীতি সারা পৃথিবীতে য়ুরোপ চালিয়েছে সেই নীতির মারাত্মক খেলা সুরু হলো য়ুরোপেই। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য ঐতিহাসিক বুদ্ধির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন জার্মানির এই প্রভু ভৃত্য-তত্ত্বের উৎপত্তি, 'জার্মাণ-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।'

পাশ্চাত্যের আত্মিক শক্তি স্বীকার করেও তার বিনাশের মূল যে তারই সভ্যতার মধ্যে লালিত হচ্ছে তাও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। মানুষের ইতিহাসে যে নিরাসক্ত দৃষ্টি না থাকলে সভ্যতার স্বরূপ সন্ধান করা কঠিন হয় সেই দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাঁর সমসাময়িক অনেকেরই ছিলনা। তারা একটি অতি সহজ ফর্মুলা বার করে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে য়ুরোপ বস্তুবাদী। সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে তৃপ্ত ছিলেন যে ভারত অধ্যাত্মবাদী। সুতরাং একটা জায়গায় আমরা বড়। এই কথাটা ভাবেন নি যে বস্তুর পিছনে প্রাণ আছে আর আমাদের অধ্যাত্মবাদ নিতান্তই পুরাবৃত্তের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার মোহে নিমজ্জিত

ছিলেন না। এই স্বাদেশিকতার অভিমানও পাশ্চাত্যের দান। যাঁরা সে দান গ্রহণ করলেন তাঁরা য়ুরোপের শেখানো জাতীয়তাবোধেই আচ্ছন্ন-দৃষ্টি হয়ে কে বেশি ভালো তার তর্ক করলেন আর বুলি আওড়ে য়ুরোপ মেটিরিয়ালিস্ট প্রমাণ করতে চাইলেন। সেই বিপদ রবীন্দ্রনাথের ছিলনা। সঙ্গতি রক্ষার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি য়ুরোপকে বুদ্ধি ও ধর্মের মুক্তিদাতা বলেছেন আবার তারই অন্তরের মৃত্যুবীজটিকেও দেখেছেন ও দেখিয়েছেন।

'সভ্যতার সংকটে' এই পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর হতাশা নির্মম নিঃসংকোচ ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। কারো কারো ধারণা যে এই মনোভাব প্রকাশ করে য়ুরোপ সম্বন্ধে তার পূর্বার্জিত সকল ধারণা তিনি বাতিল করেছেন। সে কথা সত্য নয়। যখন তিনি য়ুরোপের তীব্র সমালোচক তখনই তিনি তার চরিত্রবল, তার জ্ঞানানুসন্ধানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। যুক্তিবাদী লোকও অন্তরের গভীরে হিংস্রতার বীজ বপন করতে পারে, বৈজ্ঞানিক উন্মত্ত হলেও বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি মিথ্যা হয়ে যায় না। য়ুরোপের দুটো পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। সে পরিচয়গুলি আগে থেকে গড়া সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর বিচার বুদ্ধি, মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি তাঁর ভূগোল-না-মানা উদার স্বীকৃতি পশ্চিমের জটিল, সমস্যাসংকুল জীবনকে চেনবার সুযোগ দিয়েছে। তাই সহস্র দোষ জড়িত হলেও য়ুরোপীয় সভ্যতা তাঁর কাছে বস্তুপুঞ্জের সভ্যতা নয়, প্রাণচঞ্চল, বহু দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত, সাহসী ও লোভী, উদার ও সংকীর্ণ মানুষের ভালো মন্দ মেশানো সভ্যতা—তিনি এ সভ্যতাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নাশিকাকুঞ্চন করেন নি।
